প্রাচী

বুলবুল চৌধুরী

ঈগল পাবলিশার্স
৩০৯, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

সৃষ্টিছাড়া এই ছেলেটির সম্পর্কে যাঁর উদ্বেগ অন্তহীন, যিনি কায়মনোবাক্যে পরম বিধাতার দরবারে আমার জন্য সাশ্রুনেত্রে করুণা ভিক্ষা করে চলেছেন—যাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ আমার জীবনের বিঘ্ন-বিড়ম্বিত যাত্রাপথে একমাত্র পাথেয়—আমার

সেই একান্ত স্নেহদুর্বল

বাবাকে—

'প্রাচী' আমার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা। পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে—কিন্তু, নানা প্রতিবন্ধকতায় উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ দীর্ঘ-বিলম্বিত হয়ে গেল।

বিশ্বব্যাপী মহাসমরের দাবাগ্নি তখন পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রাচ্য দিগন্তেও ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকৃত—বাঙলা দেশও তাদের হিংস্র আক্রমণের আশঙ্কায় সংশয়াকুল। সেই প্রেত-পাণ্ডুর ছায়ালোকে চট্টগ্রামের পার্বত্য-পথে আরাকান ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে চলেছিল পলাতকের মিছিল—আকস্মিকতায় বিপর্যস্ত, শ্রান্তিতে কাতর, অবসাদে আচ্ছন্ন। আরাকান রোডের ধারে ছোট গ্রাম চুনতি—আমার জন্মভূমি—তারই পাশ দিয়ে সেই হৃত-সর্বস্ব নরনারীর মিছিল চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে অহেতুক আগ্রহে দিনের পর দিন তাদের কাছ থেকে অজস্র কাহিনী সংগ্রহ করেছি, তাদের সুদীর্ঘ পথ-যাত্রার নানা অভিজ্ঞতার কথা রেখার পর রেখায় মনের উপর দাগ কেটে গেছে। তারপরে একদিন নিজের খেয়াল-খুসীতে সেই টুকরো কাহিনীগুলিকে কল্পনার সূত্রে গেঁথে মালার মত সাজিয়ে ফেল্‌লাম—শোনালাম সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের। তাঁদেরই উৎসাহে উপন্যাস রচনায় আমার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যথাকালে সম্পূর্ণ হোলো।

এই প্রসঙ্গে একটি নিবেদন, ঐতিহাসিক তথ্য এবং বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল আছে বলেই উপন্যাসটির চরিত্রগুলোকে বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে আমার উপর অবিচার করা হবে।

প্রখ্যাত কথা-শিল্পী শ্রীযুত নারায়ণ গংগোপাধ্যায় এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও সম্প্রসারণের কাজে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে সহায়তা করেছেন। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে 'প্রাচী'র প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন নবীন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান। শ্রীযুত সন্তোষ কুমার গংগোপাধ্যায় বইটিকে মুদ্রাকর-প্রমাদের বিভীষিকা থেকে মুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। শুধু সৌজন্যের খাতিরে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।

পরিশেষে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুত গোপাল হালদারকে—যাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ এবং সহায়তায় বইটির প্রকাশ সম্ভব হলো।

৯০, যশোর রোড,
দমদম
বৈশাখ, ১৩৫৪

বুলবুল চৌধুরী

এক

ইরাবতীর তীরে ছবির মতো দাঁড়াইয়া বর্মার অপরূপ রাজধানী রেঙ্গুন।

দিনের কর্মব্যস্ততার পর যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে তখন হইতেই যেন নগরীর রূপচ্ছটা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। রেঙ্গুনের বুক জুড়িয়া আনন্দের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি জাগিয়া ওঠে। দিনের কোলাহলের চিহ্ন মাত্র থাকে না। মিল, ফ্যাক্টরীর কিম্বা ওই ধরণের যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বৈচিত্রহীন একটানা শব্দ সন্ধ্যার দিকেই স্তিমিত হইয়া আসে—রাত্রির আকাশে বাতাসে তাহার রেশটুকুও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আলোক-মালায় সজ্জিত নগরীর সরল এবং সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলি রূপার পাতের মতো চিক চিক করে। রাস্তার ফুটপাথের উপর আবার ভিড় জমিতে সুরু হয়। কাফে, রেস্তোরাঁ আর পানের দোকানগুলিতে বেচাকেনার ধূম লাগিয়া যায়। ফুলের মতো সুন্দর বর্মী যুবতীদের বিচিত্র কেশ-বিন্যাস এবং মনোরম বেশ-ভূষা চোখে যেন নেশা লাগাইয়া দেয়। সুয়ে প্যাগোডা রোড, রাণী বাগিচা এবং রয়েল লেকের চারিধার তাহাদের কলহাস্যে মুখর হইয়া ওঠে। অঙ্গের এবং কবরী-মাল্যের সুরভি ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাণী-বাগিচা কিম্বা রয়েল লেকের কোনো একধারে দল পাকাইয়া বসিয়া পড়ে এবং

অস্ফুট মধুর কণ্ঠে বর্মীগান জুড়িয়া দেয়। আর অনতি দূরেই কৌতুহলী দেশী-বিদেশীর ভিড় জমিতে থাকে। এই বর্মী যুবতীদের কেহ কেহ আবার প্যাগোডার চারপাশে আসিয়া দাঁড়ায় শ্রদ্ধানত পূজারিণীর মতো। সন্ধ্যার সমাগমে প্যাগোডায় ধ্যানী বুদ্ধের সম্মুখে যখন আরতি চলে তখন গঙ এবং গ্যামালঙের মধুর যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটির ধাতু-নির্মিত ঝালরের টুং টাং শব্দ মিলিত হইয়া এক অতি অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করে—স্নুয়ে প্যাগোডা রোডের বুক জুড়িয়া প্রতিধ্বনি জাগিয়া ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি গভীরতর হইয়া আসে—থামিয়া যায় প্যাগোডার আরতি। লেক, রাণী-বাগিচা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোক সরিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—কোলাহল করিতে করিতে বর্মী তন্বীর দল কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। যানবাহনের কর্কশ শব্দও মৃদু হইয়া আসে।......এমনি করিয়া ধীরে ধীরে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়ে সহরটি। কান পাতিয়া শুনিলে প্যাগোডার বায়ুহিল্লোলিত ঝালরগুলির একটানা টুং টাং সঙ্গীতের রেশটুকু বহুদূর হইতেও যে শোনা যায় না এমন নয়। মাঝে মাঝে রাত্রির নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বাজিয়া ওঠে গীর্জা আর অন্যান্য টাওয়ারের বড় বড় ঘড়িগুলি।

বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন। বিদেশীরাই আসিয়া যেন জাঁকাইয়া বসিয়াছে সহরটিতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ভাটিয়া সিন্ধি সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া। এখানেও কেরাণীজীবী বাঙ্গালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে নিজ নাম। অসংখ্য চট্টগ্রামবাসী এখানে আসিয়া ছোটখাট ব্যবসা জুড়িয়া দিয়াছে—সহরের অলি-গলিতে যে সব পানের দোকানগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহাতে ইহাদেরই একাধিপত্য—পরণে রঙ বেরঙের বর্মী লুঙ্গি আর গায়ে কোট চাপাইয়া তাহারা দোকানগুলিতে অধিষ্ঠান করে। মিল, ফ্যাক্টরী ও জেটিতে যে সব লোহার মানুষগুলি ব্যস্ততাভরে বিচিত্র ভাষায় কিচির

মিচির করিতে করিতে কুলির কাজ করিয়া যায় তাহারা সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আগত—কৌরঙ্গী বলিয়া পরিচিত। আর ছোট বড় রাস্তাগুলির উপরে বিচিত্র পেটেণ্ট সাইন-বোর্ড যুক্ত দোকানগুলির মধ্য হইতে পীতবর্ণ মুখগুলি উঁকি ঝুকি মারে—শুধু দন্ত চিকিৎসাতেই যে তাহারা পারদর্শী এমন নয়—রেস্তোরাঁ পরিচালনা এবং জুতার ব্যবসাতেও তাহাদের জুড়ি মেলে না।

বর্মী জনসংখ্যা বিদেশীদের তুলনায় যে অনেক কম তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইদানীং সহরটির বুকে এক প্রকার শান্তি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বর্মীদের ব্যবহার দেখিলে আজ আর বলিবার যো নাই যে কিছু কাল পূর্বে ভারতীয়দের প্রতি তাহাদের চরম আক্রোশ সারা সহর এবং সহরের উপকণ্ঠ জুড়িয়া তুমুল হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এখন শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে আর তাহার সহিত ফিরিয়া আসিয়াছে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন, নিঃশঙ্ক স্বাধীন চলাফেরা। কিন্তু এই অবিচ্ছিন্ন শান্তি বেশী দিন টিকিতে পারিল না—নির্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল। 'রেঙ্গুন গেজেট' 'রেঙ্গুন টাইম্‌স' প্রভৃতি কাগজের বিশেষ সংখ্যা জানাইয়া দিয়া গেল সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে জাপান। ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা সহরের বুকে তীব্র আলোড়ন জাগিয়া উঠিল।

তখনও সন্ধ্যা হইয়া আসে নাই। লুই স্ট্রীটের এক তেতলা বাড়ীর একটি কক্ষে ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া প্রভাত সিগারেট মুখে একটু যেন ঝিমাইতেছিল। সে আজ সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিয়া সেই যে ইজিচেয়ারখানি দখল করিয়া বসিয়াছে আর উঠিবার নামটি পর্যন্ত করে নাই। অ্যাসট্রেটি দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ সিগারেটে পরিপূর্ণ। আগত-প্রায়

সন্ধ্যা কক্ষটিকে ইতিমধ্যেই অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মুখের সিগারেট হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে নীলাভ সূক্ষ্মরেখায়। এলোমেলো ভাবনা আসিয়া তাহার মনের মধ্যে ভিড় করিতেছে।...অদূর প্রাচ্যেও অবশেষে রণতাণ্ডব সুরু হইল—যে-কালবহ্নি জ্বলিতে সুরু করিয়াছে তাহা যে নিমেষে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে ঘর ছাড়া করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী! বিস্ফোরক এবং আগুনে-বোমার আঘাতে রেঙ্গুনের মত নগরীও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে বুঝি!...রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দোহাই দিয়া রণ-পিপাসুর দল রক্তের বন্যা বহাইয়া চলিয়াছে আজ। যে মহাপরিণাম অন্যায়ের ধ্বজা উড়াইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইবে তাহাকে সে মানিয়া লইবে কী করিয়া?...

...হঠাৎ কেমন যেন উদাস হইয়া উঠিল প্রভাত। এলোমেলো ভাবে তাহার মনে পড়িতে লাগিল অতীতের কত কথা, কত ছবি।...কনভোকেসনের দিনটিতে কত স্বপ্ন লইয়াই না সে এম, কম্-এর ডিপ্লোমা হাতে বাহির হইয়াছিল সিনেট হল হইতে। কিন্তু তারপর ছয় মাস ধরিয়া জুতার সোল খোয়াইয়া সারা কলিকাতা মহানগরী চষিয়াও যখন একটা চাকরী জোগাড় করিতে পারে নাই সে তখন কী ক্ষুব্ধ অভিমানেই না হঠাৎ একদিন রেঙ্গুন যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। বেশ মনে পড়িতেছে, সেই দিন ছিল রবিবার—বেদনাহত মাকে বুকে টানিয়া লইয়া কত সান্ত্বনাই না দিয়াছিল সে—কত অসম্ভবের স্বপ্নই না সে দেখাইয়াছিল মাকে—রেঙ্গুনে গিয়া একটা বিরাট কিছু হইবার স্বপ্ন! প্রভাতের আরও মনে পড়ে—বিদায়ের দিনে জাহাজ ঘাটায় মায়ের অশ্রু-ম্লান মুখখানি। জাহাজের মন্থরগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসা আউটরাম ঘাট। আর মনে পড়িতেছে, ক্রমবিলীয়মান সেই জাহাজ ঘাটের দিকে ডেকের রেলিং ধরিয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে

কী উদ্বেল বেদনাতেই না জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহার দুটি চোখ।...

প্রভাতের মনটা একাকিত্বের চরম বেদনায় চকিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া সে ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘর অন্ধকার—চমক ভাঙ্গিতেই দেয়ালের দিকে হাত বাড়াইল প্রভাত—সুইচ টিপিতেই এক ঝলক আলোয় ঘরটি জ্বলিয়া উঠিল।

দরজার পর্দা ঠেলিয়া সুরেশবাবু প্রবেশ করিলেন। রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে রসিক এবং গুণগ্রাহী লোক বলিয়া সুরেশবাবুর খ্যাতি আছে। সাত বৎসর ধরিয়া তিনি 'বেঙ্গল-একাডেমি'র শিক্ষকতা করিতেছেন। এখানকার 'বাঙ্গালী সাহিত্য সমিতি' এবং 'প্রবাসী বাঙ্গালী সঙ্ঘ' তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রভাত নমস্কার করিয়া বলিল—এই যে সুরেশবাবু, আসুন।

সুরেশবাবু বসিতে বসিতে বলিলেন,—কি হে, তুমি যে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছ দেখছি? তা না ভেবেই বা উপায় কি—যা একখানা যুদ্ধ লাগলো!

প্রভাত কিছু বলিল না—বলিবার আছেই বা কী। শুধু তাহার স্বাভাবিক মৃদু হাসিটুকু মুখে ফিরাইয়া আনিয়া সে সুরেশবাবুর দিকে সিগারেট-কেসটি বাড়াইয়া দিল। সুরেশবাবু একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া কহিলেন: ঘর খালি করে সবাইকে ত চালান দিলাম, এখন ঠিকানায় পৌঁছুতে পারবে কিনা কে জানে?'

প্রভাত বলিল: ঠিকানা ভুল করে যদি জাপানেই চলে যায় তাতেই বা ক্ষতি কী!

সুরেশবাবু হাস্যতরল কণ্ঠে বলিলেন : তার আগেই বঙ্গোপসাগরের তলায় পৌছুতে পারবে। কিন্তু সত্যি ভাই, এখন অনেকটা যেন আশ্বস্ত হতে পেরেছি ওদের পাঠিয়ে দিয়ে। নিজের জন্য কোন চিন্তাই আমার নেই। শুনলাম তোমার পিসিমারাও চলে গেছেন। একাই ঘর আগলে রয়েছ দেখছি!

ঢং ঢং করিয়া ছ'টা বাজিল। প্রভাত ব্যস্তভাবে পাশের ঘরে পা বাড়াইল। বলিয়া গেল : একটু বসুন, চা আনতে বলছি।

সুরেশবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটা অনিশ্চিত ভীতি আর আতঙ্কে বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল : নিরাপদে রাণু পৌছিতে পারিবে ত? যাত্রীবাহী জাহাজ মারিয়া জাপানীদের লাভই বা কী হইবে? কিন্তু নিরপরাধ চীনের বুকের উপর দিয়া বর্বরতার রক্তশকট যাহারা চালাইয়া চলিয়াছে তাহদের অসাধ্য কিছুই নাই। দু একখানা সাবমেরিণ যে বে-অব্-বেঙ্গলে বিচরণ করিতেছে সে সংবাদ ত সকলেই জানে!

চমক ভাঙ্গাইয়া প্রভাতের বয় আসিয়া টিপয়ের উপর চায়ের ট্রে রাখিয়া গেল। প্রভাতও আসিয়া পড়িল। তাহার বেশভূষায় পারিপাট্য।

প্রভাত বলিল : কই, এখনো বসে রয়েছেন! চা যে জুড়িয়ে গেল।

—ও তাইত।—সুরেশবাবু এককাপ চা তুলিয়া লইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। এক চুমুক চা পান করিয়া তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিলেন : কোথাও বেরুবে নাকি?

প্রভাত সুরেশবাবুর কম্পিত স্বর লক্ষ্য করিয়াছিল। বেশ একটু

সহানুভূতির সুরেই সে বলিল ঃ সিরাজের সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে—আপনিও চলুন না বেড়িয়ে আসি।

সুরেশবাবু নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছিলেন। কাপের চা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ঃ চল একসঙ্গেই বেরুনো যাক্। পথে আমারও এক যায়গায় একটু কাজ রয়েছে।

ফরটিয়েথ স্ট্রীটের মাঝামাঝি একটা দোতলা বাড়ীতে সিরাজ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছে। চট্টগ্রাম জেলার পূর্বপ্রান্ত-সীমায় চুনতিতে তাহার বাসভূমি। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল সে রেঙ্গুনে আসিয়াছে ভাগ্যান্বেষণে। বিদেশে আসিয়া তাহার অমায়িক ব্যবহার মার্জিত রুচি, বাঙ্গালীসুলভ সহৃদয়তা এবং ঐকান্তিক প্রীতি দিয়া অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে সে। আর্থিক সমস্যাটারও কিছুটা সমাধান হইয়াছে। বিখ্যাত গোলাম মোহম্মদ এণ্ড কোম্পানীর এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের পদটি সে দখল করিয়া আছে আজ চার বৎসর ধরিয়া। ইতিমধ্যে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ফিরদৌসকে দেশ হইতে আনাইয়া একটা ছোটখাট দোকান খুলিয়া বসাইয়া দিয়াছে। মাত্র কিছুদিন আগে মাস দু' একের জন্য সিরাজ একবার দেশে গিয়াছিল। বৃদ্ধা মাতার একান্ত অনুরোধ তখন উপেক্ষা করিতে পারে নাই—বিবাহ করিয়াই সে ফিরিয়াছিল।

সেদিন সিরাজ অফিস ছুটির পর দোকানের দিকে না গিয়া সোজাসুজি বাড়ী চলিয়া আসিল। প্রতিদিন ফিরদৌসের দোকানটি পরিদর্শন না করিয়া সে বাড়ী ফিরিত না, কিন্তু আজ যে কেন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল কে জানে। এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষটির অন্তর গভীর ভাবে

উদ্বেলিত। ৭ই ডিসেম্বর যেদিন জাপান প্রাচ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে সেইদিন হইতে তাহারও কী যেন হইয়াছে—মুখের হাসি ম্লান, চোখের দীপ্তি স্তিমিত। ফিরদৌসকে লইয়া ইদানীং তাহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইতেছে। তাহার একগুঁয়েমী বড়ই পীড়া দিতেছে সিরাজকে। ফিরদৌস কিছুতেই দেশে ফিরিবে না! যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মাঝখানে রেঙ্গুনে তাহার থাকা চলিতেই পারেনা—সিরাজ কত বুঝাইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা—বোমাকে নাকি সে ভয় করেনা এবং যতদিন সিরাজ যাইবেনা ততদিন সেও রেঙ্গুনে থাকিবেই। তাহার পাগলামি সিরাজকে বিপন্ন ও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

সিরাজ বাড়ী ফিরিয়া সটান্ বিছানায় শুইয়া পড়িল। তারপর ডেস্ক হইতে প্যাড ও কলম বাহির করিয়া চিঠি লিখিতে স্বরু করিয়া দিল। লেখার সাথে সাথে তাহার কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল ধীরে ধীরে। পাতার পর পাতা কী যেন সে লিখিয়া চলিল। চিঠি লেখা যখন শেষ হইল তখন তাহার কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে সাতটা বাজিল। মিনিট কয়েক পরেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল।—ঘরে আসিয়া ঢুকিল প্রভাত। এক ঝলক হাসি ছড়াইয়া খেয়ালীর মত বলিয়া উঠিল—শিগগীর বেরিয়ে চল—আজ রাতটা সেলিব্রেট্ করতে হবে।

প্রভাতের প্রস্তাবে সিরাজ সিনিকের মত হাসিয়া উঠিল, বলিল: তোমার কী মাথা খারাপ হল!

মাথা তাহার সত্যিই যে খারাপ হয় নাই সে কথাটা সিরাজ ভাল করিয়াই জানে কিন্তু সে বুঝিয়া উঠিতে পারেনা প্রভাত কোন্ প্রাণ-ধর্মের বলে এত নির্ভীক এবং নির্লিপ্ত হইতে পারিয়াছে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সিরাজের মন ভরিয়া উঠে।

—মাথা খারাপ হয়নি ভাই, মাথা খারাপ হয়নি। রাজায় রাজায় লড়াই; এতে তারাই মরবে। তোমার-আমার ভেবে কী লাভ? জাপানী বেটাদের বোমা যে আমাদের মাথায় পড়বে না এ আমি হলফ করে বলতে পারি।—কথাগুলি প্রভাত একটু উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া ফেলিল এবং পরমুহূর্তেই সিরাজের হাত ধরিয়া প্রায় টানিতে টানিতেই তাহাকে বাহির করিয়া আনিল।

সিরাজ প্রভাতকে ভাল করিয়াই চিনিত—তাহার কাছে কোন আপত্তিই যে আমল পাইবার নয়!

রেঙ্গুন সহরের সেই রূপ আর নাই। এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন সারা সহরটিতে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মৃত জড়ের মত পড়িয়া আছে রেঙ্গুন—প্রাণের স্তিমিত স্পন্দনটুকু পর্যন্ত অনুভব করিবার উপায় নাই। ব্ল্যাক-আউটের কালো পর্দার আড়ালে নগরী যেন গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কোথায় সেই বর্মাসুন্দরীদের শোভাযাত্রা! প্যাগোডা হইতে সন্ধ্যারতিকালে কোনো যন্ত্র-সঙ্গীতের রেশ তো আকাশে বাতাসে মাতামাতি করিয়া বেড়ায় না। সুয়ে প্যাগোডা রোড, রাণী-বাগিচা এবং রয়েল লেক সন্ধ্যা হইতে না হইতেই প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। ছোট ছোট পার্কগুলি স্বাভাবিক সময়ে শিশুদের কোলাহলে মুখরিত থাকিত; কিন্তু আজ সেগুলি শূন্য—খাঁ খাঁ করিতেছে। শত সহস্র নরনারী, বালকবালিকা নগরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছে। যাহারা নিতান্ত বাধ্যতামূলকভাবে এখনও রহিয়া গেছে তাহাদের সেই প্রফুল্লতা কোথায়? ম্লান-গম্ভীর বিষণ্নমুখে মাঝে মাঝে যে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চায় তাহা যেন কান্নার চাইতেও করুণ। অস্বাভাবিক আতঙ্ক এবং বিপুল

বিক্ষোভে নিষ্পেষিত হইয়া রেঙ্গুন সহরটি যেন মহাপরিণামেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

ক্যালকাটা রোড দিয়া রয়েল লেকের দিকে প্রভাতদের রিক্সাখানা একটানা গতিতে ছুটিয়া চলিল। সহরের উপকণ্ঠস্থিত রয়েল লেকের নিকটবর্ত্তী সহরতলী অংশটির নাম কান্দুগ্লে। এই অঞ্চলটিতে জনৈক বাঙ্গালী পরিচালিত যে একটি রেস্তোরাঁ রহিয়াছে তাহারই সম্মুখে রিক্সাটি আসিয়া থামিয়া গেল।

রেস্তোরাঁটির এক কোণ ঘেঁষিয়া প্রভাত ও সিরাজ আসন লইল। তাহাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড উন্মুক্ত জানালা। শীতের হিমেল হাওয়া বহিতেছিল সিরসির করিয়া। জানালার ভিতর দিয়া তাকাইলে রাতের নক্ষত্রখচিত মেঘমুক্ত উদার আকাশের অনেকখানিই চোখে পড়ে। এই যায়গাটি তাহাদের বড়ই প্রিয়। কফির সাথে সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে এই স্থানটিতে বসিয়া কথা কহিতে তাহারা একান্তই ভালবাসে। প্রতিবারের মত বয় তাহাদের সম্মুখে কফির ট্রে রাখিয়া গেল।

নীরবে তাহারা পেয়ালা দুইটি নিঃশেষ করিলে, দ্বিতীয়বার পট্ হইতে কফি ঢালিতে ঢালিতে প্রভাত প্রশ্ন করিল: বাইরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছ সিরাজ?

সিরাজ মুখ ফিরাইল: কী আর ভাববো বল! ফিরদৌসটা কিছুতেই যাবেনা! সেদিন দ্বিগুণ দাম দিয়ে একটা ডেক্ টিকিট্ জোগাড় করলাম তার জন্যে, আর সে কিনা বেমালুম লুকিয়ে রইল! কিছু একটা ঘটলে তাকে নিয়ে যে কী দুর্ভোগ সইতে হয় কে জানে?

প্রভাত সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল: সে ভেবে তো কোন লাভ হবেনা—যখন সে যাবেই না তখন তুমিই বা আর কী করবে! নিতান্ত ছেলে মানুষ তো আর নয় যে ভয় দেখিয়ে ঠেলে পাঠাবে। আমাকে

তো স্পষ্টই বলেছে কিছুতেই সে এখন একপাও নড়বে না। তুমি ভেবে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ।

সিরাজ কী যেন ভাবিতেছিল হঠাৎ একটু উচ্ছ্বসিত হইয়াই বলিয়া উঠিল,—চল না, আমরা সবাই মাসখানেকের ছুটি নিয়ে ঘুরে আসি?

প্রভাত এবার রীতিমত হাসিয়া উঠিল: তুমি এত ভীরু তা তো জানতাম না সিরাজ! আগে তো বোমা পড়ুক তারপর না হয় যাবার কথা ভাবা যাবে।

মুহূর্তে সিরাজের মুখখানায় ব্যথার ছায়া পড়িল। কোন কথাই বলিতে পারিল না সে।

প্রভাত বুঝিল সিরাজ মনে আঘাত পাইয়াছে। লজ্জিত হইয়া কোমল স্বরে সে বলিল: যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না ভাই,—এ-সময় ছুটিই বা দিচ্ছে কে আমায়? আমি বলি, তুমিই বরং যাও ফিরদৌসকে নিয়ে।

•

সিরাজ যতখানি আগ্রহ লইয়া প্রথম যাওয়ার প্রস্তাবটা করিয়াছিল প্রভাতের কথায় এবং হাসিতে সে ততখানিই দমিয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই বোধ করি যখন প্রভাত পুনরায় যাওয়ার কথা উত্থাপন করিল তখন সিরাজ শুধু এই বলিয়াই কথা শেষ করিল যে সেও ছুটি পাইবে না।

কতক্ষণ নীরবে কাটিল জানিনা। অকস্মাৎ ভীতিবিহ্বল স্বরে সিরাজ কহিল: দেখেছ প্রভাত, দেখেছ!

সিরাজের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া প্রভাত উন্মুক্ত বাতায়নটির মধ্য দিয়া আকাশের পানে চাহিল। তাহার চোখে পড়িল, নিয়তির নিষ্ঠুর সংকেতের মতো অগ্নিকোণ হইতে একটা প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড সাঁ সাঁ করিয়া যেন ঠিক রেঙ্গুনের বুকের উপরই আসিয়া পড়িতেছে, যেন অন্তরীক্ষ হইতে কে একটা বহ্নিময় মৃত্যুবাণ পৃথিবীর বুক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

দুই

২৩শে ডিসেম্বর—মঙ্গলবার।

সারা সহরটি এক অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছে। শীতের রাত্রে যে গাঢ় কুহেলি রেঙ্গুনের বুকে ছড়াইয়া পড়ে, আজ সূর্য উঠিবার পরেও তা অপসারিত হইবার নাম করিতেছে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ রহিয়াছে বৈ কি;—বাহিরের কুহেলি-ম্লান আবহাওয়া অন্তরটিকে যেন বিষাদের প্রচ্ছন্ন আভাসে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে আটটা বাজিল—ইরাবতীর বুকে চলন্ত জাহাজ এবং লঞ্চগুলি হইতে মাঝে মাঝে যে সিটি বাজিয়া উঠিতেছিল তাহাও যেন আজকাল নিতান্ত অর্থহীন। নাগরিকের দল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই গাত্রোত্থান করিতে সুরু করিল। এক ধরণের অদ্ভুত অনুভূতি, এক প্রকার অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা সবার মনে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে যেন।

সিরাজ যখন অফিসে পৌঁছিল তখন নটার বেশী হইবে না। আজ একটু সকাল সকালেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে। সাড়ে দশটায় কাস্টম হাউসে যাইতে হইবে তাহাকে—আমেরিকা হইতে সেদিন লোহালক্কড়গুলির যে এক চালান আসিয়াছে তাহা লইয়া কী একটা গোলমাল বাধিয়াছে। নিজের অভ্যস্ত স্থানটি দখল করিয়া সিরাজ চারিদিকে একবার তাকাইল—অফিসে তখনও কেহ বড় একটা আসে নাই,—দূরে টাইপিষ্ট কৃষ্ণন্

মেসিনটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী যেন করিতেছিল। অফিসের দু'একটি বেয়ারাকেও চোখে পড়িতেছিল কখনো সখনো।

সিগারেট ধরাইয়া সিরাজ ড্রয়ার হইতে একটা ফাইল বাহির করিয়া লইল। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। ফাইলটার উপর যতই সে মন বসাইতে চেষ্টা করিল ততই সে উদাস হইয়া উঠিতে লাগিল। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা পুড়িতে পুড়িতে কখন যে মাটিতে পড়িয়া গেছে তা সে জানিতেও পারে নাই। জানিবেই বা কী করিয়া—তাহার মন তখন অভিসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চট্টগ্রামের পূর্বপ্রান্ত-সীমায় শ্যামল পাহাড়ে ঘেরা যে পল্লীটি চিত্রপটের মত জাগিয়া আছে, তাহারই একটি লজ্জাবতী সুন্দরী কিশোরী-বধূকে লইয়াই তখন তাহার মন স্বপ্ন রচিয়া চলিয়াছে।

এমনিভাবে অনেকক্ষণই যে কাটিয়া গেছে সন্দেহ নাই—অফিসের প্রায় সবাই আসিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। একজন বেরসিক বেয়ারা সিরাজের সম্মুখে আসিয়া প্রকাণ্ড একটা সালাম ঠুকিয়া ইম্‌পোর্ট রেজিস্টারটি যখন টেবিলের উপর রাখিতে গেল তখনই তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘড়ির দিকে চাহিতেই সে ব্যস্ততাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিলম্ব হইয়া গেছে অনেক। সাড়ে দশটার এ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা বুঝি নষ্ট হইয়া যায়। হ্যাঙ্গার হইতে কোটটি লইয়া যখন সে বাহিরে যাইতে উদ্যত ঠিক তখনই চারিদিক কাঁপাইয়া হঠাৎ সাইরেণ বাজিয়া উঠিল।

সাইরেণ তো রেঙ্গুনে প্রায়ই বাজিতেছে আজকাল—কিন্তু এই মুহূর্তে তাহার তরঙ্গিত দীর্ঘ ধ্বনিটা সিরাজের কানে কেমন অপরিচিত ঠেকিল। বিসর্পিল কম্পিত ধ্বনিরেখায় যেন আকস্মিক একটা ভীতির স্পন্দন পড়িল ছড়াইয়া। সিরাজের হৃৎপিণ্ডটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একটা আসন্ন বিভীষিকাকে অনুভব করিয়া তাহার পাঁজরের গায়ে ধ্বক্ ধ্বক্

করিয়া কয়েকটা আঘাত করিল। আর সেই মুহূর্তেই আকাশের ইথার-সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া বজ্রবাহী লৌহ-ঈগলের দল নামিয়া আসিল রেঙ্গুনের বুকে ছোঁ মারিতে। উল্কার সংকেত কি এত তাড়াতাড়িই সত্য হইয়া গেল!

অপ্রত্যাশিত ভাবে সাইরেণ বাজিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অভাবনীয় তুমুল আলোড়ন জাগিয়া উঠিল সারা সহরময়।...জনপথগুলি হঠাৎ আতঙ্ক-পীড়িত জনতার কোলাহলে মাতিয়া উঠিয়াছে—উর্ধ্বশ্বাসে সকলেই ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে দিকহারা লক্ষ্যহীন ভাবেই। পিছন পানে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ কোথায়! নিমেষের মধ্যেই দোকান-পাট, আফিস-বাড়ী প্রায় শূন্য হইয়া পড়িল। মূর্খ জনতা বিমান আক্রমণ-মূলক সব সতর্কতা যেন মন্ত্রবলে গুলাইয়া ফেলিয়াছে। এই ভীতি-চঞ্চল নাগরিকদের মধ্যে কেহ কেহ স্লিট্-ট্রেঞ্চ দেখিতে পাইলে তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল; কেহ কেহ উন্মুক্ত পার্কগুলিতে জড় হইয়া বিধাতার নাম জপ করিতে সুরু করিয়া দিল, আবার কেহ কেহ উর্ধ্বশ্বাসে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিয়াই চলিল। সাইরেণ বাজিয়াই চলিয়াছে। জাপ বোমারু-বাহিনীর প্রপেলারের বিরামহীন গর্জনধ্বনি সকল কোলাহলকে অতিক্রম করিয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

তারপর যে মৃত্যুযজ্ঞ সুরু হইল তাহা বর্ণনার বাহিরে। সভ্যতার অন্তর মথিয়া মানুষের যে লোভ পৃথিবীময় দেখা দিয়াছে—হাজার হাজার টন বোমার অগ্নিজিহ্বায় তাহা রেঙ্গুনকে লেহন করিয়া গেল। বিস্ফোরণ,—ধূলা, ধোঁয়া, পোড়া গন্ধক আর রবারের দুর্গন্ধ,—আর সবকিছু ছাপাইয়া মানুষের তীব্র অন্তিম-আর্তনাদ। মানুষ: যে-মানুষ বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে দাঁড়াইয়াছে বিজ্ঞানের রাজমুকুট পরিয়া—যে-মানুষ রচনা করিয়াছে শিল্প—বিজ্ঞান—সাহিত্য;—যে মানুষ দেখিয়াছে

ইউটোপিয়ার স্বপ্ন আর যাহাদের ভাবনা রূপ পাইয়াছে গৌতম-বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট এবং হজরত মোহম্মদের প্রেমের বাণীতে।

যে ভীত এবং কৌতূহলী বিপুল জনতা বোতাতং মাঠে ভিড় জমাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একশত লোকও কী বাঁচিয়া আছে! লুই স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ জেটিটা টুকরা টুকরা হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া গেছে। কৌরঙ্গী কুলিদের একপাল পিঁপড়ার মতো কে যেন লোহার একটা রোলার দিয়া পিষিয়া গেল! ইরাবতীর জলে ডুব দিয়াও তাহারা বাঁচিতে পারিল না। নদীর তীরবর্তী ডক্ এবং সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে যেন গলিয়া পড়িয়াছে! বগুলা বাজারের জনবহুল অঞ্চলটি ধ্বসিযা যেন পাতালে গিয়া ঠেকিয়াছে! আকাশে স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় বিমানে যুদ্ধ,—ক্রমাগত মেশিন-গানের শব্দ। কয়েকখানা বিমান ঘুরিতে ঘুরিতে রেঙ্গুনের এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। জ্বলন্ত বিমান হইতে উত্থিত কালো ধোঁয়ায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। ফস্ফরাস্-বোমার ছোঁয়াচ লাগিয়া ইতিমধ্যেই কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। লুইস্ট্রীট্, ষ্ট্রাণ্ড রোড, ফিফ্‌টি সেকেণ্ড স্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তায় রক্তপ্লাবন।

অকস্মাৎ সাইরেণ বাজিয়া উঠিতেই সিরাজ অফিসের একটি কোন ঘেঁষিয়া সেই যে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর একপাও নড়ে নাই। আতঙ্ক-বিহ্বল কর্মচারী এবং বেয়ারার দল আফিসের প্রায় সব কিছুই ওলট-পালট করিয়া দিতে দিতে বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল বোধকরি; সিরাজের বজ্রকণ্ঠ গর্জিয়া উঠিল হঠাৎ—ধমক খাইয়া বিমূঢ়ের দল যে যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া পড়িল। বেয়ারা রামনাথ এবং রহমৎ দু-একজনকে প্রায় ঠেলিয়া ফেলিয়া ইতিমধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

চীনা স্ট্রীটের উপর বিরাট অট্টালিকা 'গোলাম মোহম্মদ বিল্ডিংস'-এর নিচতলার অংশটি জুড়িয়া সিরাজদের অফিস। নিরাপত্তার দিক দিয়া এই বাড়ীর নিচতলাটি মন্দ কি। ডাইরেক্ট হিট্ ব্যতীত বাড়ীটির খুব কমই ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে! এই চরম অতর্কিত বিপদের মুহূর্তে এক মহা-আতঙ্ক মনটিকে যেন পিষিয়া মারিতেছিল—আর বুঝি রক্ষা নাই! সিরাজ প্রথমে কাঁপিল না, তাহার ভাবপ্রবণ মনটি কেমন যেন নিঃশঙ্ক এবং শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনের এই পরিস্থিতি সহসাই পরিবর্তিত হইয়া গেল। কিসের এক তীব্র কশাঘাতে সে মুহূর্তে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে : কিন্তু ফিরদৌস্? ,ফিরদৌস বাঁচিয়া আছে তো?

তখনও অল্‌ক্লিয়ারের সঙ্কেত পড়ে নাই। চীনা স্ট্রীট ধরিয়া সিরাজ ছুটিয়া চলিয়াছে—প্রপেলারের ধ্বনি অনেকটা যেন স্তিমিত;—বোমা বোধ-করি আর পড়িবে না। আর পড়িলেই বা কি,—মনের দুর্দম কোন প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যখন উদভ্রান্ত হইয়া ওঠে, তখন সাময়িক ভাবে তাহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। কোন কিছু বিচার করিয়া দেখিবার সিরাজের সময় নাই।, ডালহাউসি স্ট্রীট তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল—মোড় ফিরিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল সে। রাস্তার দোকান পাট সবই খোলা। মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এখানে ওখানে কয়েকটি লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে! জানালা এবং সো-কেশ হইতে রাশি রাশি কাঁচ ফুটপাথের উপর লক্ষ টুকরায় ছড়াইয়া আছে আর তাহাদের গায়ে রক্তের ছিটা লাগিয়া প্রখর সূর্যালোকে সেগুলি যেন চুনির মতো জ্বলিতেছে। লুই স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া সিরাজ মুহূর্তের জন্ত একটু যেন থমকিয়া দাঁড়াইল,—রাস্তাটিতে রক্তের বন্যা ডাকিয়াছে—হতভাগ্য নাগরিকের দল এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া

রহিয়াছে। রাস্তার মাঝখানটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে একটা বিরাট খাদ —কলকল করিয়া জল উঠিতেছিল তখনও। আশ্চর্য,—মাত্র দু ঘণ্টা আগে রেঙ্গুনের এই পরিণতি কে কল্পনা করিতে পারিত! ছবির মতো সুন্দর অপরূপ সহর চকিতে লইয়াছে প্রেতপুরীর রূপ—যেন বিসুবিয়াসের ক্ষুধায় পম্পিয়াই বিধ্বস্ত হইয়া গেছে! অর্ধচূর্ণ বাড়ীগুলি হইতে রাশি রাশি ইটের ধূলায় আকাশ অন্ধকার—বিশাল অট্টালিকাগুলির খানিকটা মাটিতে শুইয়া আছে, কতকটা শূন্যে অসহায়ভাবে ঝুলিয়া আছে ত্রিশঙ্কুর মতো। রাবিশের স্তূপে পথঘাট একেবারে ঢাকা পড়িয়া আছে কোথাও। ইলেকট্রিকের ছিন্ন তার—আর উৎক্ষিপ্ত পোস্টগুলি পরম বন্ধুর মতো জড়াজড়ি করিয়া আছে। ইটের তলা হইতে মানুষের দেহের অংশ-বিশেষ বাহির হইয়া আছে—ধ্বসিয়া পড়া কড়ি-বরগাগুলি বিরাট চাপে তাহাদের যেন সযত্নে আগলাইতেছে; যেন এমনি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রাখিয়াই তাহাদের মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবে! আর আশে পাশে যে সব ক্ষত-বিক্ষত মানুষের ছড়াছড়ি, তাহাদের মধ্যে কাহারো শিরভাগ দেহচ্যুত, কাহারো বিচ্ছিন্ন দেহাংশ রক্তমাখা অবস্থায় মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছে,—কেহবা মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাইতেছে—বিকৃত মুখ হইতে বহিয়া পড়িতেছে রক্তের ঝলক। আবার কেহ কেহ ঠিকরাইয়া-পড়া-চক্ষু মেলিয়াই যেন চিরনিদ্রায় অভিভূত। বিধাতার রাজ্যে এও একধরণের মৃত্যু! কিন্তু এ-সব লইয়া ভাবিবার অবকাশ সিরাজের কোথায়? দেখিয়াও সে যেন কিছু দেখিতেছে না। ভ্রূক্ষেপহীন সে ছুটিয়াই চলিল। ফরটিয়েথ স্ট্রীটে পৌছিতে বেশি বিলম্ব হইল না। বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই তাহার সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। কবাট আর জানালাগুলি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে যে! বিহ্বলভাবে নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে সে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল: ফিরদৌস! ফিরদৌস!

কিন্তু কে কোথায়! তাহারই আকুল চীৎকারের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনই প্রত্যুত্তর আসিল না। সিরাজের চোখে সব কিছুই ঘোলাটে হইয়া আসিল। পায়ের নিচে পৃথিবীটাও নড়িয়া উঠিল যেন। দেয়ালের গায়ে ফিরদৌসের বড় ফটোগ্রাফখানা ঝাপসা হইতে হইতে নিমেষে মুছিয়া গেল!

এই অবস্থায় কতক্ষণ কাটিল জানি না—কিসের একটা প্রচণ্ড ঝাকুনি খাইয়া তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। প্রায় দমকা হাওয়ার মতোই সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ফিরোজা স্ট্রীটের বুক চিরিয়া সিরাজ চলিয়াছে—বোমারুর দল বোধকরি ফিরিয়া গেছে—প্রপেলারের শব্দ আর শোনা যাইতেছে না। সমস্ত সহরটি কেমন যেন ধোঁয়াটে—পোড়া বারুদের তীব্র গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। ফিরোজা স্ট্রীটের বুক চিরিয়া সিরাজে চলিয়াছেই। এই রাস্তাটির সঙ্গে যেথানে থারটি-সেভেন্থ স্ট্রীট মিলিত হইয়াছে সেই মোড়টিতে আসিয়া একটি দোকানের উপর সিরাজের ব্যাকুল দৃষ্টি পড়িতেই তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল—দোকানটি বন্ধ! এতক্ষণ আশা-নিরাশার মীমাংসাহীন সংঘাত তাহার বুকের পাঁজরগুলিকে পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছিল—এই মুহূর্তে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইল—এক ফুৎকারে আশার ক্ষীণ শিখাটি দপ্ করিয়া নিভিল—বুক ভাঙ্গিয়াই গেল।

ইহার পর সিরাজের আর চলিবার শক্তি ছিল না। পা দুটিকে কোন প্রকারে টানিয়া টানিয়া সে চলিতে সুরু করিল। শরীরটা যেন পাথর হইয়া গেছে—নিজের দেহ-ভারে সে ঢলিয়া পড়িতে চায়—নিজেকে সামলাইয়া লইবার ক্ষমতাটাও তাহার লোপ পাইয়াছে। ফেয়ার স্ট্রীটের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে চাটার্ড ব্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া সিরাজ একবার উদাস-দৃষ্টি তুলিয়া উচ্চ অট্টালিকাটির পানে চাহিল।

তখনও 'অল-ক্লিয়ার' ধ্বনিত হয় নাই—প্রভাত নিজের ছোট কামরাটিতে চেয়ারেই বসিয়া আছে। পা দুটি টেবিলের উপর ; ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট পুড়িতেছে। 'যাহা ঘটিবার ঘটুক' এমনি একটা মানসিক নির্বেদ আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাকে।

দুয়ার ঠেলিয়া মাতালের মতো ঘরে প্রবেশ করিল সিরাজ।

তাহাকে দেখিয়া প্রভাত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া সিরাজের দিকে আগাইয়া আসিল সে। সিরাজ এবার প্রায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই প্রভাত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার অবস্থার দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল : একি! কী হয়েছে ?

সিরাজের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথা সরিতে চায় না—অস্পষ্ট একটি মাত্র কথা রুদ্ধকণ্ঠ হইতে প্রায় ঠেলিয়াই বাহির হইয়া আসিল :—ফিরদৌস!

সহরের উত্তর প্রান্তে প্রসিদ্ধ রয়েল লেক। স্বাভাবিক সময়ে অবসর বিনোদনের একটি সুন্দরতম স্থান হিসাবে কতজনকেই তো আকর্ষণ করিয়াছে। এই চরম দুর্দিনেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ২৩শের সেই অভাবনীয় দুর্ঘটনার পর দলে দলে লোক আসিয়া লেকের চারিধারে ডেরা গাড়িয়াছে। সহরের মাঝখানে বোমার তলায় বুক পাতিয়া থাকিতে এতটুকু ভরসা নাই কাহারো।

২৫শে ডিসেম্বর—বৃহস্পতিবার।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া ওঠে নাই। পশ্চিমাকাশের ধূসর পটভূমিকায় এক ফালি চাঁদ জ্বল জ্বল করিতেছে। শীতের তুহিন

বাতাসে লেকের তীরবর্তী ঝাউগাছগুলি যেন করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। সম্মুখে স্পন্দনহীন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ম্রিয়মাণা নগরী। তখনও রেঙ্গুনের আকাশ ধূমায়িত। —আজ প্রচণ্ড ভাবে যে বিমানাক্রমণ হইয়াছে, ইহা বোধকরি তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সহর আজ অস্বাভাবিক রকম শান্ত। শুধু দু'একটা কুকুরের হৃদয়ভেদী অস্পষ্ট করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে মধ্যে মধ্যে।

রেঙ্গুনের বর্মীবাসিন্দারা ইতিপূর্বেই পল্লী অঞ্চলে চলিয়া গেছে। কিন্তু বিদেশী যাহারা তাহাদেরই তো যত রাজ্যের ভাবনা। এই মৃত্যুর লীলাভূমি হইতে তাহারা যে পলাইয়া বাঁচিতে চায় না এমন কথা কে বলিবে! কিন্তু পলাইতে চাহিলেই তো আর পলানো যায় না—ইহারো একটা প্রস্তুতি আছে যে। কত লোকই তো জাহাজ-ঘাটা হইতে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিল। চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও টিকিট পাওয়া যায় না। যাহাদের অর্থাভাব তাহাদের তো কোন কথাই নাই। আর অর্থ থাকিলেই বা কী—সকলের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা নাই—বিশেষ শ্রেণীর নারী, শিশু কিম্বা অক্ষমের দল ব্যতীত কাহারো যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া নাকি কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্ভব নয়।

লেকের চারপাশে মুমূর্ষুপ্রায় যে বিরাট জনতা, তাহাদের মধ্যে কোরঙ্গী কুলি এবং চট্টগ্রামবাসী মুসলমানেরা সংখ্যায় গুরু। লঘু সংখ্যার দলে কিছু ভদ্র বাঙ্গালী, কিছু বিহারী এবং কিছু কিছু অন্যান্য ভারতীয়।

একটি ঝাউগাছের নিচে প্রভাত, সিরাজ, সুরেশবাবু এবং বিকাশ আশ্রয় লইয়াছে। প্রভাত একটা সুটকেসের উপর মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি উন্মুক্ত আকাশের দিকে নিবদ্ধ—তারার প্রদীপ একটির পর একটি জ্বলিয়া উঠিতেছে। সুরেশবাবু ঝাউগাছটির গুড়ি ঠেসান দিয়া পা ছড়াইয়া বসা অবস্থায় সম্মুখের পানে তাকাইয়া

রহিয়াছেন। বিকাশ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে; আর সিরাজ ভাঁজকরা ওভারকোটটিতে মুখ গুঁজিয়া প্রভাতের পাশে পাথরের মত পড়িয়া আছে—যেন শীতল ধরণীর উপর বুক রাখিয়াই সে প্রাণ জুড়াইতে চায়।

কাহারো মুখে কথা নাই। এই নির্বাক মুহূর্তে কাহার মনে কী জাগিতেছিল তাহার ইতিহাস কে লিখিবে?

হাত কয়েক তফাতে সিরাজের স্বগ্রামবাসী কয়েকজন লোক লইয়া একটা দল—তাহাদেরই কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ কাতর কণ্ঠে ঈশ্বর ও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতেছে।

কিন্তু জঠরের ক্ষুধা বলিয়া যে এক অদ্ভুত বোধ রহিয়াছে কোন অবস্থাতেই তা যে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নয়!—এখানে ওখানে কাঠের উনুনগুলিতে লক লক করিরা আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে—দূর হইতে মনে হয় যেন কতকগুলি স্তিমিত চিতা জ্বলিতেছে।—লেকের শান্ত জলে তাহারই বিচিত্র নৃত্যভঙ্গী। এদিক ওদিক হইতে শিশু-ভগবানদের কান্না ভাসিয়া আসিতেছে। আর যাহারা প্রিয়জন হারাইয়া নিজেরাই শুধু বাঁচিয়া আছে তাহাদের কেহ কেহ লোকান্তরিতের অদৃশ্য-চরণের শব্দ শুনিতে পাইয়াই বুঝি মাঝে মাঝে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

সারা সহর এবং সহরের উপকণ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন ফিরদৌসের সন্ধান মিলিল না তখন একটা অঘটন ঘটিযাছে বলিয়া ধরিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। সকলের মুখে বিষণ্ণতার স্পষ্ট ছায়া—সিরাজের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। কিন্তু প্রভাতের কেন জানি ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে ফিরদৌস বাঁচিয়াই আছে। নিজের সহজাত অনুভূতির উপর তাহার প্রচণ্ড বিশ্বাস। প্রভাত ধীর শান্ত কণ্ঠে আকাশের দিকে চোখ রাখিয়াই বলিয়া উঠিল; এমন কাতর হয়ে পড়লে চলবে কি করে

সিরাজ ? আমি বলছি সে বেঁচে আছে,—সে এমন অস্বাভাবিক ভাবে মরতেই পারে না।—তাহার হৃদয়ের অনির্বাণ আশাবাদ কথাগুলিকে গভীর আবেগে ভরিয়া দিল।

প্রভাতের কথাগুলি সিরাজের মনটিকে হঠাৎ গভীর ভাবে নাড়া দিয়া গেল। হৃদয়ের আকাশে পুঞ্জীভূত বেদনার যে অন্ধকার, তাহার মাঝখানটিতে আশার একটি ক্ষীণ শিখা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যেন ঃ ফিরদৌস বাঁচিয়া আছে! কিন্তু সেই আলোর রেখাটুকু কেন জানি মুহূর্তের মধ্যেই আবার মিলাইয়া গেল ঃ বাঁচিয়াই থাকিত যদি তবে ইতিমধ্যেই কী সে তাহার কোন সন্ধান পাইত না ?—গভীরতর অন্ধকার আবার, জমাট বাঁধিয়া উঠিল !—কোন উত্তরই জোগাইল না তাহার কণ্ঠে।

কতক্ষণ কাটিয়া গেছে বলিবার উপায় নাই। লেকের চারপাশে যে উনুনগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিবিয়া গেছে। যে কয়েকটি তখনও জ্বলিতেছে সেগুলিও প্রায় নিবু নিবু! সিরাজের স্বগ্রামবাসী যাহারা নিকটেই দল পাকাইয়া বসিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে কাহার যেন এক উচ্চকণ্ঠ চকিতে চারিদিক প্রায় কাঁপাইয়া তুলিল ঃ ফিরদৌস এসেছে, ফিরদৌস এসেছে!

আকাশ হইতে আকস্মিক কোন দৈববাণী হইলেও বোধকরি এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত না তাহারা। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পলকে ঘিরিয়া ফেলিল ফিরদৌসকে। এই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে সিরাজের উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছিল। পূর্বের মতো নিশ্চল হইয়াই রহিল

সে। কেবল তাহার চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিতে লাগিল—সহস্র চাঁদের মেলা বসিয়া গেল লেকের জলে।

রাত্রি তখন গভীর।

শীতের গাঢ় কুহেলি চারিদিকে জমিয়া উঠিয়াছে। ঝাউগাছগুলির পাতা হইতে মাঝে মাঝে ঝরিয়া পড়িতেছে শিশির-বিন্দু। লেকের চতুষ্পার্শে যে নীরবতা জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহারই বুক চিরিয়া এক একবার শোকার্ত এবং আহতদের অস্ফুট ব্যাকুল আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। প্রভাতের তন্দ্রাটুকু কখন যে টুটিয়া গিয়াছিল তা সে নিজেও বোধকরি জানিতে পারে নাই। চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিয়াছে: বোমা অবশেষে পড়িলই! শতাব্দীর অভিশাপের অগ্নিময় জ্বালা যখন চারিদিকে তাহার লকলকে জিভ মেলিয়া ধরিয়াছে তখন মানুষ ঘুমাইবেই বা কেমন করিয়া। ঘুম,—ঘুম তো দূরের কথা এতটুকু শান্তি, এতটুকু তৃপ্তি, একটুকু স্বস্তিও যে রহিবে না আর! শতাব্দীর বিরাট অগ্নিযজ্ঞে তাহাদের মৃত্যু-পরীক্ষা হইবে বুঝি! জীবন যাপনের প্রচণ্ডতম গ্লানি, রূঢ় বাস্তবতার মর্মান্তিক নিষ্পেষণ, ব্যর্থ প্রেমের তীব্র করুণতা, হতাশা এবং নৈরাশ্যের ঐকান্তিক দুঃসহতা —এই সবই তো সে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সর্বনাশা যুগ-বিপর্যয়ের কঠোরতম সত্যকে কী সে তেমনি সহজ ভাবেই মানিয়া লইতে পারিবে?...পারিবে বৈ কি—নিজের জন্ম কোন চিন্তাই সে করে না। কারণ, যুগ-বিপ্লবের প্রলয়-ঝড়ের শেষেই সত্য ও সুন্দরের মঙ্গলমূর্তি দেখা দিবে,—তাহার আদর্শবাদী মন এ-কথা পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করে। যখন নবীনের প্রয়োজন হয়, পুরাতনের অপমৃত্যু তো তখন অবশ্যম্ভাবী।...

ভাল করিয়া কম্বলখানি গায়ে জড়াইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই শুনিতে পাইল, সিরাজ ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করিয়া কী যেন বলিতেছে। প্রভাত হাত বাড়াইয়া তাহাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিল : কি হে সিরাজ, কী সব বকছো অমন কোরে!

সিরাজ ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া গেল। একটু নড়িয়া চড়িয়া সহজ স্বরে বলিল : কই না। আমি কিছু টের পাইনি তো!

প্রভাত হাসিয়া বলিল : মুস্কিল এই যে, টের পাওয়ার অবস্থা যখন আসে তখন কথা বলবার অবস্থা আর থাকে না। কিন্তু সত্যি বলো তো, ঘুমের ঘোরে এত স্নেহ-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করছিলে কাকে? দুঃস্বপ্ন নয় সে তো বুঝতেই পারছি, আর জাপানীরাও এমন কিছু তোমার প্রাণের মানুষ নয়।

সিরাজ লঘু স্বরে কহিল : কী বলছ, জাপানীরা প্রাণের মানুষ নয়! কত ভালবাসে দেখছ না? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিনরাত এসে হাজার হাজার টন বোমা গিলিয়ে যাচ্ছে—এর পরেও বলবে জাপানীরা প্রাণের মানুষ নয়?

প্রভাত মৃদু হাসিয়া বালিশের তলা হইতে সিগারেট কেশটি বাহির করিয়া একটা সিগারেট নিজে ধরাইল এবং আর একটি বাড়াইয়া দিল সিরাজের দিকে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচিয়া সিগারেট পুড়িয়া চলিয়াছে।—রাতের মৌন আকাশ তলে এই দুটি বন্ধু পাশাপাশি শুইয়া যত রাজ্যের ভাবনা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। একটা চাপা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল সিরাজ। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল : তুমি আমাদের যাওয়া সম্পর্কে কিছু একটা ভেবে দেখেছো প্রভাত?

প্রভাত সহজভাবেই বলিল : দেশে ফিরতে চাইলে পায়ে হেঁটে

পাড়ি দেওয়া ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। জাহাজের খবর তো শুনেছই।

—পায়ে হেটেই যখন চলতে হবে তখন আর দেরী করে লাভ কী। কাল সকালেই—

প্রভাত সিরাজের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই বলিল: বেশ তো সকাল হলে স্টেশনে গিয়ে প্রোমের গাড়ীতে জায়গা পাই কিনা দেখি চল। আর যদি নাইই পাই তা'হলে মোটরে যাবার চেষ্টা কোরব।—শুনেছি এই দু'দিনে প্রায় দশ বিশ হাজার লোক প্রোমের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে।

পরিচিত একটা কবিতার লাইন সিরাজ গুন্ গুন্ করিয়া উঠিল:

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু জন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী—

প্রভাত পরিহাস করিয়া কহিল; কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে হারানো হিয়ার কুঞ্জ?

সিরাজ শান্ত কণ্ঠে বলিল: তাই যদি, তা'হলে সাবধানী পথিকেরা না হয় পথ ভুলে ঘুরেই মরবে। পথ চলা আর পথ ভোলা, দুটোই তো জীবনের সমান সত্য।

তিন

পরদিন—২৬শে ডিসেম্বর।

সাইক্লোন-তাড়িত সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো দিশাহারা এক বিপুল জনতা স্টেশনে আসিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িয়াছে। শত সহস্র কণ্ঠের কোলাহলে চারিদ্দিক ফাটিয়া পড়িতে চায়; কানে তালা লাগে। প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদের এই যে জোয়ার, তাহার মুখে মানুষের মনুষ্যত্বটাও কুটার মতো বুঝি ভাসিয়া গেছে। এদিকে ওদিকে শুধু বিভ্রান্ত মানুষের চীৎকার আর হাতাহাতি—বন্ধ ঝাঁপের মুখে খেদায়-পড়া-হাতীর পালের দাপাদাপি আর গুঁতাগুঁতির মতোই করুণ এবং ভয়াবহ। কে কাহার আগে ঢুকিয়া পড়িবে তাহারই জন্য এক একটা খণ্ড যুদ্ধ চলে যেন মানুষে মানুষে, দলে দলে। আর ইহাদের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে বিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া ওঠে কেহ কেহ—এক একজন মূর্চ্ছিত হইয়া হয়তো পরক্ষণে ঢলিয়াই পড়ে মানুষের অমানুষিক চাপে। ব্যাটন ঘুরাইয়া ক্বচিৎ কখনো একজন বর্মী পুলিশ আসিয়া হাজির হয় ঘটনাস্থলে—আশ-পাশের দু'একজনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু বিমূঢ়ের দল বুটের লাথি আর ব্যাটনের গুঁতা নির্বিকারে হজম করিয়া ফেলে ঠায় দাঁড়াইয়া! কেহ এতটুকু নড়ে না।—এক পাও পিছাইয়া পড়িবার যে উপায় নাই আজ।

বিশেষ করিয়া স্টেশনের ওভার-হেড-ব্রীজটার উপরেই যেন অধীর জনতার চাপটা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠের কলরব আর চরম উত্তেজনা—যেন বিপুল হাহাকার পড়িয়া গেছে জনতার মধ্যে। ব্রীজের নিচে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মটায় একখানা ট্রেন অতিকায় অজগরের মতো পড়িয়া আছে। ট্রেনের প্রতিটি দরজা ও জানলার মুখে মুখে পলাতকের দল কিল বিল করিতেছে মৌমাছির ঝাঁকের মতো। তুমুল সোরগোলের মধ্যে অসম্ভব রকমের ধস্তাধস্তি—যে কোন উপায়ে ঢুকিয়া পড়ার সে কী আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু ঢুকিবেই বা কোথায়? তিল ধারণের স্থানটুকুও অবশিষ্ট নাই কামরাগুলিতে। তবু কাহারো উদ্যমে শৈথিল্য জাগে না এতটুকু। উত্তেজনার চরম অবস্থায় মানুষের সমস্ত বিচার শক্তি এমনই লোপ পাইয়া বসে বুঝি!

প্ল্যাটফর্মটিতে ঢুকিবার গেটটা বন্ধ। তাহার মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে চট্টগ্রাম আর নোয়াখালিবাসীর একটা প্রকাণ্ড দল। কখন হইতে ধর্ণা দিয়া রহিয়াছে কে জানে। এই প্রতীক্ষমান জনতার মধ্য হইতে চাটগেঁয়ে কে একজন প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল: বাপ দাদার পরাণটা নিয়ে দেখছি আর ফিরতে দেবে না হালারা। দেখ না গেইটটা খুলবারও নাম করে না কেউ!

গোলাপের ছবি চিহ্নিত টিনের একটা ছোট সুটকেশ বগলের নিচে ভাল ভাবে চাপিয়া ধরিয়া অপর একজন কহিল: এখন একবার যদি সিটি বাজে আর বোম্ পড়ে তবে ত দেখি—

—থাম মিয়া থাম, যত সব অলুক্ষণে কথা কইতে হবে না তোমারে। ভালোয় ভালোয় সহরটা একবার ছাড়ি যাই, তারপর যত ইচ্ছা পড়ুক বোম।—মোল্লা গোছের একজন বলিয়া উঠিল।

—জাপানীরা এবার কিন্তু ইস্টিশনটারে বগুলা বাজারের মত ধ্বসাইয়া ছাড়বে দেখি নিয়ো।

শুনিয়া মোল্লা গোছের লোকটি 'আল্লা' 'আল্লা' করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু উত্তর দিল অন্য একজন রসিক ধরণের লোক পিছন হইতে: হুঁ; জানে বাঁচি থাকলে তো দেখবো, না কী? তবে হ্যাঁ, ইট পাটকেলের তলা থেকে তোমার আমার মুর্দা ধরগুলা দেখলেও দেখতি পারে কেমনতর বাহারটা হবে ইস্টিশনের।

ইহাদের মধ্যে একজন এতক্ষণ কিছু একটা বলিতে আকুলি বিকুলি করিতেছিল। এইবার সে আশ্বাস দিয়া বসিল: ডর কিসের ভাই সব, জাপানীরা ইস্টিশনে বোম্ ফেলে না। আমাদের সঙ্গে তাদের দুস্‌মনিটা কী? বির্‌টিস্—

—দুত্তর মিয়া।—প্রচণ্ড একটা ধমকে লোকটিকে পাশের একজন থামাইয়া দিল: বলি, দাঁত বার করি তো খুব কথা কইছ। এদিকে যে মিয়া তোমার জুতার চাপে আমার পায়ের নখটারে মাড়িয়ে কিছু রাখলে না, সেদিকে কী কোনো হুঁস আছে? এই ভিড়ে আবার তেনার পায়ে জুতা! ঠমক দেখে আর বাঁচি না!

গেটের ওপাশ দিয়া একজন সিপাই চলিয়াছে। চোখে মুখে অপরিসীম কৌতুক। যেন চারিদিকের এই দৃশ্য সে উপভোগ করিতেছে।

চট্টগ্রামের প্রথম বক্তাটি মুহূর্তে অধীর হইয়া উঠিল: ও ভাই সিপাই; গেইটটা খুলি দাও না। সেই মাঝ রাত থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সব। আর তো পারি না। শিরদাঁড়ায় যে টনটনানি ধরি গেল। এবার মেহেরবাণী করি খুলি দাও।

বর্মী সিপাইটি খুদে খুদে চোখে একবার পিট পিট করিয়া চাহিল। তারপর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল অন্যদিকে।

—দেখছো, হালা আবার হাসে! পিত্তি জ্বলি যায় দেখে।

—হাসবে বৈ কি। ওদেরই তো খোস-খবর। হালাদের চোদ্দ পুরুষ আসছে যে।

—আরে জানি মিয়া জানি। ওদের মতলবটা ঠাহর পাইছি। এই সুযোগে আমাদের সঙ্গে আবার একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় কিনা তাই দেখো।

কোলাহল-মুখর স্টেশনে জনতার এই অদৃষ্টপূর্ব ভিড় দেখিয়া প্রভাতের দল হতভম্ব হইয়া গেল।

প্রভাত মৃদু হাসিয়া কহিল—গণ-দেবতার যে রুদ্র রূপ এখানে দেখছি, তাতে আমাদের মতো ক্ষীণ প্রাণের অবিলম্বে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এসো, এসো, বেরিয়ে এসো সব। যে কোরে হোক মোটরের ব্যবস্থা একটা করতেই হচ্ছে।

স্টেশনের বাহিরে একটা খোলা জায়গায় আসিয়া সবাই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্বস্তির একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত কহিল; আহ্ বাঁচা গেল; আর কিছুক্ষণ থাকলে দম আটকে মরে ছিলাম আর কি!

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সুরেশ বাবু তরল স্বরে কহিলেন: আচ্ছা ভায়া, এই কৌরঙ্গী ব্যাটারা দৈনিক ক পাউণ্ড কোরে হিং আর রসুণ খায় বলো তো?

—কী করে বুঝলেন?

—কী করে বুঝলাম! কেন ভায়া, শ্রীঅঙ্গের সুবাসে টের পেলে না? ব্যাটারা সব এক একটা—কী বলে সাক্ষাৎ গন্ধমাদন আর কি।

সিরাজ ওভার কোটটা কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া বলিল, গন্ধ-তত্ত্ব এখন থাক। গ্রামে যাওয়ার কী বন্দোবস্ত হল সেইটে শুনি?

প্রভাত বলিল ; তাইতেই তো ভাবনায় পড়ে গেলাম। ট্রেনের অবস্থা তো নিজেরাই দেখে এলে। আপাততঃ একবার কান্দুয়ের দিকে বরং যাওয়া যাক, ছোট একটা বাসের খোঁজ পেয়েছি। দরে বনলে প্রোম পর্যন্ত তো নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে।

তাহাদের ছোট দলটি ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিল। ইহার মধ্যেই কোন এক ফাঁকে সিরাজ গুণ গুণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে :

উর্ধে গগনে বাজে মাদল:
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ-প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।

রেঙ্গুনের উত্তর প্রান্ত-সীমা হইতে সুরু করিয়া যে-রাজপথটি সোজা উত্তরমুখী ইনচিন, তাইচি, থারওয়াডি, লেটপেডাং, জবিংগো, সুইডাং প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের মধ্য দিয়া প্রোমে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই 'প্রোম রোড' নামে পরিচিত। আজ এই অস্বাভাবিক সময়ে এই পথটি দিয়া অবিরাম জনস্রোত উত্তর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ট্রেনে যাহাদের স্থান হইল না কিম্বা যাহারা ট্রেনের জন্য আর এক মুহূর্ত মৃত্যুমগ্ন রেঙ্গুনে থাকিতে প্রস্তুত নয়, তাহারাই পথটি দিয়া সুরু করিয়াছে তাহাদের দুঃখের যাত্রা। যাহারা চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে কোরঙ্গী কুলি আর চট্টগ্রামবাসী গরীব মুসলমান দিন-মজুরদের সংখ্যাই বেশী। মধ্যে মধ্যে দুএকখানা ট্যাক্সি বা লরীও হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে প্রোম অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে ভারমন্থর গতিতে।

কিন্তু এই পলাতকের দলই যে শুধু পথটির উপর ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে তাহা নয়—রাস্তার দুদিকের গ্রাম হইতে দলে দলে বর্মীরাও পথ-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আজ। প্রচুর খাবার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে তাহারা। দুর্গত পথিকদের মধ্যে যে যাহা পারে বিলাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইতেছে যেন। ইহাদের সহানুভূতি, ইহাদের সৌজন্য পলাতকদের মন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া তুলিয়াছে।

প্রভাতদের বাসখানা ছুটিয়া চলিতেছিল।

তখনও সন্ধ্যা হইয়া আসে নাই। দূরে থারওয়াড়ি নামক ছোট সহরটি অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোকে অপূর্ব সুন্দর দেখাইতেছে। বিকাশ ইতিহাসের ছাত্র—এই মুহূর্তে তাহার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিয়াছে, —বিশ্বব্যাপী হিংস্র সংঘর্ষে মোহাচ্ছন্ন মানুষ আজ যে ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারই একটা পরিণতি সে কল্পনায় দেখিতেছে বোধহয়। সিরাজ ও প্রভাত পাশাপাশি একটা সিটে বসিয়া থারওয়াড়ির দিকেই চাহিয়া আছে। বর্মা-চুরুট মুখে সুরেশবাবু বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছেন। দলের অন্যান্যরা পিছনের সিটগুলি দখল করিয়া চট্টগ্রামী ভাষায় নানা আলাপ আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু ফিরদৌস এ আলাপ-আলোচনার মধ্যে ছিলনা—করুণ দৃষ্টি মেলিয়া সে চাহিয়াছিল পিছন পানে—যতদূর চোখ যায় ততদূর। রেঙ্গুন ছাড়িয়া আসিতে তাহার কিশোর প্রাণে কী গভীর ব্যথাটাই না বাজিতেছে। তাহার রঙিন যত সব স্বপ্ন এক নিমেষে যে এমনি ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খান খান হইয়া যাইবে, তাহা কী সে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল কোনদিন? আকণ্ঠ ফুঁপাইয়া তাহার কান্না আসিতেছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই থারওয়াড়ি আসিয়া পড়িল। বাসখানা সহরে

প্রবেশ করিতে না করিতে কোথা হইতে দশ বার জন বর্মী তরুণী রাস্তার উপর আসিয়া তাহাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার ব্রেক কষিতেই বাসটি ঘিরিয়া ফেলিল তাহারা। তারপর মখমলের থলি হইতে পাতা মোড়া ছোট বড় প্যাকেট বাহির করিয়া গাড়ীর ভিতরে প্রায় ছুঁড়িয়াই ফেলিতে লাগিল। তাহাদের এই যে উপহার, ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে কে? নিজেদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দিতেও তাহাদের এতটুকু আপত্তি নাই যেন। বর্মী তরুণীদের মধ্যে একজন হঠাৎ বিকাশের একটা হাত চাপিয়া ধরিল এবং সুন্দর গ্রীবাখানি একটু হেলাইয়া অনুনয়ের সুরে দুর্বোধ্য বর্মী-ভাষায় বলিল : চনরো এ-মা লাবা।

বিকাশ মেয়েটির ভাষা না বুঝিলেও তাহার কাতর অনুরোধটুকু যে কি তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইল। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিলনা সে। বর্মীভাষাটা এতদিন অবহেলা করিয়াই শিখে নাই বলিয়া আজ সে সত্যিকারের বেদনা বোধ করিল। অবশেষে সিরাজ বর্মী ভাষায় সুন্দরীদের লক্ষ্য করিয়া বলিল : বিশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ করবেন, বাড়ীতে গিয়ে আমরা আপনাদের অনর্থক বিব্রত করতে চাইনা—তা ছাড়া জিনিষপত্তর সবই প্রায় আমাদের সঙ্গে রয়েছে—দুটি ভাত রেঁধে নিতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না, আর রাতের বিশ্রামটুকুও মোটরের ভেতরেই বেশ সেরে নেওয়া যাবে।

সিরাজের কথা শুনিয়া আর একটি মেয়ে তাহার দিকে আগাইয়া আসিল এবং বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সুললিত কণ্ঠে কহিল : বেশ তো লোক আপনি! আমরা থাকতে আপনাদের মোটরে থাকতেই বা দিচ্ছে কে? শিগগীর নেমে আসুন। ঐ যে ছোট্ট প্যাগোডার পাশে কাঠের বাড়ীখানি দেখছেন, 'ওখানেই আপনাদের আজ থাকতে হবে। আর এও বলে রাখছি, আপনাদের খাবারটা আমরাই তৈরী করবো।

মেয়েটি কথাগুলি এমন একটা নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গিতে বলিল যে, এই সামান্য অনুরোধটুকু সিরাজের কাছে প্রীতি-মধুর আদেশ বাণী বলিয়াই মনে হইল। তাহার সাধ্য কী যে এই আদেশ অমান্য করে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—মুখ দিয়া কোন কথাই সরিলনা। সন্ধ্যার এক ঝলক রাঙা আলো তখন মেয়েটির পীতবর্ণ সুন্দর মুখখানির উপর একটা অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম মায়াজাল বুনিয়া তুলিয়াছে।

সবে মাত্র দিনের প্রথম আলোর ম্লান আভাস সূচিত হইয়াছে পূর্বাকাশে। পশ্চিম দিগন্ত হইতে তখনও রাতের কালো ছায়া সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই। শীতের এই শান্ত উষার অপূর্ব ক্ষণে গারওয়াডি সহরটিকে রহস্যাতুর বলিয়া মনে হইতেছিল। তখনও ব্যাপকভাবে পরিচ্ছন্ন ছোট্ট সহরটিব বুকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় নাই। প্রভাতের দল কাঠের বাড়ীটি হইতে বাহির হইয়া আসিল মালপত্র লইয়া। পুনরায় যাত্রা সুরু করিতে হইবে তাহাদের।

বাসে মালপত্রগুলি বোঝাই করা শেষ হইতে না হইতেই নারীকণ্ঠের কলগুঞ্জন শোনা গেল। সেই তরুণীর দলটি নিতান্ত বিস্ময়কর ভাবেই আসিয়া দেখা দিল। একজনের হাতে একটি কেট্‌লি, অপর একজন কয়েকটি ছোটবড় চায়ের পেয়ালা লইয়া আসিয়াছে; অন্যান্য তরুণীদের মধ্যে কেহ আনিয়াছে ফল-ফুলুরি কেহ বা রেকাবী ভরা বিস্কুট; কেহ বা কয়েক প্যাকেট পোলো সিগারেট। সিরাজ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: আপনারা এই সাত সকালে এ সব করেছেন কী বলুন দেখি! রাঁতে আমাদের আকণ্ঠ খাইয়েও কী আপনাদের তৃপ্তি হয়নি?

মাআলা নামের মেয়েটি স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসিয়া বলিল: কী যে বলেন!

কী-ই বা এমন খাওয়াতে পেরেছি আপনাদের? থাক্ ওসব কথা— এখন চট্ পট্ চা-টা খেয়ে ফেলুন তো সবাই।

দ্বিরুক্তি করিয়া লাভ নাই কোন। ইহাদের কথায় এবং ব্যবহারে এমন গভীর প্রীতি এবং আন্তরিকতা রহিয়াছে যে কেহ কোন প্রকার আপত্তি জানাইতে পারিল না।

চা পান পর্বটা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। নিজের সিট হইতে বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইল সিরাজ: তোমাদের এই মধুর ব্যবহার আমাদের অনেকদিন স্মরণ থাকবে—বিদায় বন্ধু বিদায়।

বর্মী তরুণীরা হাসিতে হাসিতে কী যেন অভিনন্দন জানাইল তাহাদের। সুরেশবাবু বলিলেন: মেয়েগুলো দেখতে তো বেশ কিন্তু কথাটাই বলে কেমন কিচির মিচির করে। কী বললে সিরাজ?

সিরাজ কহিল: বললে, আমাদের ভুলোনা, ত্রুটি নিয়োনা।—বলিয়াই সে গুন গুন করিয়া উঠিল:

প্রণাম নিয়ো পথের প্রিয়, দিয়ো আশীর্বাদ—
চিহ্ন যদি রয় গো মনে ক্ষমো অপরাধ।

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়া বাসখানা চলিতে আরম্ভ করিল। বর্মী তরুণীর দল হাত নাড়িতে নাড়িতে চলন্ত বাসটির দিকে চাহিয়া রহিল অনিমেষ চোখে। তারপর সম্মুখের রাস্তাটি যেখানে বাঁক ফিরিয়াছে সেইখানে একটা কাঠের গুদামের আড়ালে তরুণীদের শুভ্র মূর্তিগুলি দৃষ্টির বাহিরে হারাইয়া গেল।

প্রভাতদের বাসখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া বিচিত্র রোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিতেছে সারা দেহে। পূর্বাকাশে রঙের মেলায় ভাঙ্গন ধরিয়া গেছে সূর্যের আবির্ভাবে। কিছুক্ষণ হইল লেট্‌পেডাং অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহারা—দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামে পৌছিতেও পারে হয়তো।

বেলা বাড়িতেছে। কয়েকটি ছোট বড় পল্লী পার হইয়া আসিয়া প্রভাতদের বাসখানা নিতান্ত আকস্মিক ভাবে সুইডাং-এর বাজারে পৌছিতে না পৌঁছিতেই থামিয়া গেল বারকয়েক শব্দ করিয়া। কারবোরেটার তেল টানিতে পারিতেছিল না। কয়েক মিনিট সময় লাগিবে বলিয়া ড্রাইভার জানাইয়া দিল। গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল যাত্রীর দল। আর মুহূর্তে কৌতূহলী জনতা গাড়ীখানাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

মেরামতের কাজ চলিতেছে। প্রভাত মাডগার্ডে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতে সুরু করিয়াছে। সিরাজ নিকটবর্তী একটা মুদির দোকান হইতে চাল ডাল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। কয়েকজন বর্মী আসিয়া ইতিমধ্যেই কয়েকটি পুঁটলি বাঁধা কী সব সুরেশ বাবুর হাতে দিয়া গেছে। বর্মী বালক বালিকার ছোট্ট একটি দল ড্রাইভারকে ঘিরিয়া কিচির মিচির করিতেছে।

হঠাৎ কাহার উপর যেন প্রভাতের দৃষ্টি পড়িয়া গেল। একটি পাঁচ ছয় বছরের বর্মী মেয়ে সম্মুখের ছোট গলিটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। তাহার ছোট্ট সুকোমল হাতে একটা প্রকাণ্ড আখ। প্রায় টানিতে টানিতেই

লইয়া আসিতেছে সেইটি। ধীরে ধীরে মেয়েটি প্রভাতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রভাত নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতেছিল—কেন যেন মনে হইল এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার কতকালের চেনা! মেয়েটি নিজেই আগাইয়া আসিয়াছিল। কে তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে কে জানে, কিন্তু আর সকলের মতো সে-ও এই পলাতকদের কিছু উপহার দিয়া স্মৃতির পাতায় নিজের চিহ্ন রাখিতে চায়।

তাহার অপাপবিদ্ধ সরল মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটি তাহার ছোট্ট সুন্দর হাতটি বাড়াইয়া আখের টুকরটা প্রভাতের সামনে ধরিল। আর দু'হাত পাতিয়া সেই দান গ্রহণ করিয়া প্রভাত ধন্য মনে করিল নিজেকে। পরম স্নেহে সে মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পলকহারা চোখে মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়াই রহিল।

গাড়ী স্টার্ট নিতেই চমক ভাঙ্গিল প্রভাতের। মেয়েটির ছোট্ট কপালে একটি চুমা দিয়া সে ধীরে ধীরে তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। নিজের সিট হইতে প্রভাত মুখ বাড়াইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৃদুভাবে হাসিল। মেয়েটি তাহার হৃদয় বুঝিয়াছিল কিনা কে জানে; সে-ও ফিক্ করিয়া হাসিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া কেবলই লিলির কথা মনে পড়িতেছে প্রভাতের। হাসির সঙ্গে তাহার তুল্‌তুলে গাল দুটিতে চমৎকার টোল পড়িল—হাসিলে লিলির গালেও ঠিক এমনি করিয়াই টোল পড়িত!

কিন্তু কতক্ষণ বা! যাত্রার আহ্বান যাহাদের আসিয়াছে, পথের নোঙর কয়টি মুহূর্তের জন্য তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে! বাস চলিতে সুরু করিল, তারপর কয়েকটি নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতেই

প্রভাতের বেদনাচ্ছন্ন ট্রর বাহিরে মেয়েটির পেলব-করুণ মুখখানি মিলাইয়া গেল।

প্রোম।

উত্তর-পশ্চিম ব্রহ্মের মধ্যে এই সহরটির অনেক দিক দিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পশ্চিম দিক দিয়া ইরাবতী প্রবাহিত। ব্যাবসা-বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্র হিসাবে যতটা না হোক, আরাকান এবং ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী সহর হিসাবেই ইহার বেশী নাম ডাক। এই সহরটিতেও রেঙ্গুনের মতো ভারতবাসীরাই আসিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে। সকল প্রকার ব্যবসা তাহাদেরই একচেটিয়া।

বাসখানা পূর্বনির্দেশ মত জুয়েলার স্ট্রীটের সিমজীদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া থামিল। রেঙ্গুনে যে কোম্পানীর সহিত সিরাজ এতদিন সংশ্লিষ্ট ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি তাহারই স্থানীয় এজেণ্ট বিশেষ। ইতিপূর্বে সিরাজকে দু'একবার কোম্পানীর কাজে প্রোমে আসিতে হইয়াছিল। সেই হইতে সিমজীদের এই প্রতিষ্ঠানটির সত্বাধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই তাহার হৃদ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। সিরাজ বাস হইতে নামিতেই দোকানের প্রায় সকলেই আসিয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইল। ইহাদের মধ্যে একজন সুরাটী কর্মচারী প্রথম খবর দিল: আপনারা রেঙ্গুন ছেড়ে তো চলে আসছেন, কিন্তু এদিকে গতকাল থেকে প্রোম-টাঙ্গুপের রাস্তা গভর্ণমেণ্ট যে বন্ধ করে দিয়েছে সে খবর শুনেছেন তো?

সিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল: বন্ধ করে দিয়েছে; সে কি! কখন আবার রাস্তা খুলে দেবে জানেন?

আর একজন কহিল : তার কোন স্থিরতা নেই। আজ আপনারা আসবার একটু আগে ঢাক পিটিয়ে সারা সহরে জানানো হয়েছে, যে-সব ইভ্যাকুইজ এসেছে বা আসছে তাদের আবার ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে।

সিরাজ বলিল : বাঃ, এতো বেশ আবদার দেখছি! যদি আমরা ফিরে না যাই!

প্রভাত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল : যদি না যাও তবে ধরে ধরে গাড়ীতে তুলে চালান দেবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা নয়—কী উপায় করলে অন্ত কোথাও না গিয়ে থাকতে পারা যায়, সেটাই এখন ভেবে চিন্তে বার করতে হবে।—বলিয়া প্রভাত মুখ ফিরাইয়া সুরাটী ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিল : আচ্ছা বলতে পারেন আজ অবধি যারা এসেছে তারা এখন কোথায়?

সুরাটী ভদ্রলোকটি বেশ গুছাইয়া বলিলেন : প্রায় দশ বারো হাজার লোককে ইতিমধ্যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ গতকাল থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে গভর্নমেণ্ট। আর তারপর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত প্রায় দশ বারো খানা বোঝাই ট্রেন হাজার কয়েক ইভ্যাকুইজদের নিয়ে দক্ষিণমুখী গিয়েছে। গভর্নমেণ্ট তাহাদের রেঙ্গুনে নিয়ে যাচ্ছে কি অন্ত কোথাও নিয়ে যাচ্ছে বলতে পারিনা। তবে গ্রামবাসীদের প্রতি আদেশ জারী হয়েছে যেন তারা কোন ইভ্যাকুইজকে স্থান না দেয়।

চিন্তায় সকলের মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কী বিড়ম্বনা বাধিয়া বসিল আবার!

কিন্তু পরক্ষণে নিতান্ত বিস্ময়কর ভাবেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল—কোথা হইতে স্বয়ং সিমজী সাহেবরে আবির্ভাব ঘটিল। সিরাজকে দেখিয়া প্রায় টানিতে টানিতেই তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। যাইবার

সময় কর্মচারীদের হুকুম দিয়া গেলেন, অতিথিদের সাদরে ভিতরে আনিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে। প্রভাতের দল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুক হইতে একটা ভারী পাথর যেন নামিয়া গেল সকলের।
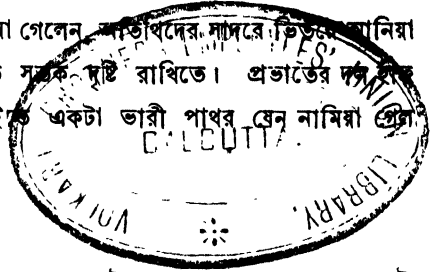
বিরাট একটা হলঘর। মেঝের উপর ফরাস পাতা। কয়েকটি মখমলের তাকিয়া সারি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের চার কোণে এক একটি ছোট শ্বেত পাথরের টেবিল—টেবিলের উপর রূপার এক একটি রেকাবী, আতরদান আর গোলাবপাশ। দরজায় এবং জানালায় জরীর কারুকার্য খচিত পর্দা। প্রথম দৃষ্টিতেই ঘরখানিকে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বলিয়া মনে হয়।

পর্দা ঠেলিয়া পর পর হলঘরে প্রবেশ করিলেন সুরেশবাবু, প্রভাত, সিরাজ ও বিকাশ। ফরাসের উপর বসিয়া একটা তাকিয়া ঠেস দিতে দিতে সুরেশবাবু তৃপ্তির উদ্গার তুলিলেন: খাসা খাওয়াটা হল কিন্তু! যে যাই বলুক সিরাজ, তোমাদের মত রাঁধতে আর কোন জাতই পারে না—তা সে চাইনিজ কুক্‌ই বল আর ইটালিয়ানই বল!

সিরাজ গর্বের ভান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল: আমরা রাঁধতে পারবোনা তো পারবে কে?

বিকাশ সিগারেটের একগাল ধোঁয়া গিলিয়া মন্তব্য করিল: তা তো বটেই—নবাবের জাত যে! স্রেফ ওই এক ভোগ-বিলাসেই তো গেলে তোমরা—আবার বাহাদুরী নিচ্ছ!

সুরেশবাবু বলিলেন: ভোগ-বিলাসের সঙ্গে কোন জাতির অধঃপতনের একটা সম্বন্ধ আছে স্বীকার করি; কিন্তু এটাও তোমাকে মানতে হবে

যে এই ভোগ-বিলাসের মধ্যেই একটা জাতির সৌন্দর্য-প্রিয়তা আর রুচির পরিচয় মেলে।

বিকাশের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল: কিন্তু সে-সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা আর রুচি কোনো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেনা,—অলস আর পঙ্গু কোরে দেয়, আদর্শের প্রতি অন্ধ কোরে তোলে। সে জন্যেই তো, যে জাতি একদিন ক্রুসেডের বান রোধ করেছিল—স্পেন অবধি নিজেদের সাম্রাজ্যবিস্তার করে ফেলেছিল, সেই জাতির—

প্রভাত বাধা দিয়া উঠিল,—ওসব আলোচনা এখন থাক বিকাশ। এদিকে যে ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠলো তার কী করা যায় তাই ভাব।

ব্যাপার যে সত্যই গুরুতর তাহাতে সন্দেহ কি। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার মীমাংসা করা চলিবেনা। সিমজী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন, পালন করা ছাড়া উপায় নাই। টাঙ্গুপের রাস্তা এখন বন্ধ; কখন খুলিবে তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য পুলিশের চোখ এড়াইয়া তাহাদের গ্রামে থাকা চলিতে পারেনা। একবার চোখে পড়িলে ধরিয়া ধরিয়া হয়তো অন্য কোথাও চালান দিয়া বসিবে। নিরুপায় হইয়া মান্দালয়েই যাইতে হইবে তাহাদের। মোটরে টেন্‌ডাউনজি; তারপর ট্রেনে পিনমনা হইয়া মান্দালয়। সেখানেই তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে টাঙ্গুপের রাস্তা খুলিয়া গেলে সিমজী সাহেব তার করিয়া তাহাদের জানাইবেন। আর শেষ অবধি যদি রাস্তাটা না-ই খোলে তবে মণিপুর রোড দিয়াই নাকি অগ্রসর হইতে হইবে তাহাদের।

সুরেশবাবু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, ভেবে আর কী-ই বা হবে বল? হোয়াট্ ক্যাণ্ট্ বি কিওর্‌ড্ মাস্ট্ বি এ্যানডিওর্‌ড্।

গত দু'বছর ধরিয়া অধ্যাপনায় এবং ভারতের ঐতিহ্য-বিষয়ক কী

একটা থীসিস্ প্রস্তুতিতে বিকাশ এতই ডুবিয়াছিল যে, সর্বদা মান্দালয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করা সত্ত্বেও সে বর্মার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সহরটি সময়ের অভাবে পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারে নাই। তাই আজ একটা সুযোগ আসিতেছে দেখিয়া সে রীতিমত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল ঃ মান্দালয় যাওয়া নিয়ে এত ভাববার যে কী আছে আমি তো বুঝতে পারছিনা—তা ছাড়া এমন একটা সহর ফিরতি পথে দেখে যেতে পারবো এটা তো সৌভাগ্যের কথা!

প্রভাত রূঢ়ভাবে কী একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় সিমজী সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইলেও যৌবনের জৌলুস তাঁহার দেহ হইতে মিলাইয়া যায় নাই এখনো। বলিষ্ঠ পেশল দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। পরণে সিল্কের সাদা লুঙ্গি, গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পানজাবী—সৌখিন ভদ্রলোক। ফরাসের উপর উপবেশন করিয়া সিমজী সাহেব সরল হিন্দিতে বলিলেন ঃ আপনাদের কোন রকম খেদ্‌মতই করতে পারলাম না—শুধু তক্‌লিফ্ দিলাম। মাপ করবেন।

—কী যে বলছেন আপনি! তক্‌লিফ্ তো আমরাই দিচ্ছি আপনাকে।—বিনীত ভাবে সিরাজ কহিল।

—না না, তক্‌লিফ্ কিসের। আপনারা হচ্ছেন মেহ্‌মান, আমি তো শুধু আপনাদের একজন খাদেম মাত্র।—বলিয়া বিনয়ের হাসি হাসিয়া সিমজী সাহেব সিগারেটের টিনটি আগাইয়া ধরিলেন: মনে হচ্ছে, মান্দালয়ে যেতে বলায় আপনারা বড্ড বিপন্ন বোধ করছেন—কিন্তু কিছু ভাববেন না। আপনাদের মারফৎ আমার ছোট ভাইকে আমি চিঠি দিয়ে দেবো। তার ওখানেই আপনারা থাকবেন। কোনো তক্‌লিফ্ হবে না।

—তক্লিফের কোনো প্রশ্নই আসেনা সিমজী সাহেব। আমরা শুধু ভাবছি কাছেই কোথাও গিয়ে যদি অপেক্ষা করতে পারতাম।

—দেখুন প্রভাতবাবু, আমি সবদিক ভেবেই আপনাদের মান্দালয়ে যেতে বলেছি। প্রোম-টাঙ্গুপের রাস্তা যদি না খোলে তবে আপনাদের মণিপুর রোড দিয়েই যেতে হবে। মান্দালয় থেকে মণিপুর রোড ধরবার বিশেষ সুবিধে রয়েছে। আর এদিকে যদি এর মধ্যে টাঙ্গুপের রাস্তাটা খুলেই যায় তাহলে তো আমি তার করে দেবো—চলে আসতে কতক্ষণ।

সুরেশবাবু ভাঙ্গা হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন : আপনার কি মনে হয় না শিগ্গীর টাঙ্গুপের রাস্তাটা আবার গভর্নমেণ্ট খুলে দেবে ?

—শেষ পর্যন্ত ইভ্যাকুইজদের যে সরকার কর্তৃপক্ষ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে আমার কিন্তু মনে হয় না। তবে অন্তত কিছুকালের জন্যে যে রাস্তাটা বন্ধ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কী।

সিরাজ প্রশ্ন করিল : মণিপুর রোডও কী এখন বন্ধ ?

—মণিপুর রোড বন্ধ থাক বা না থাক, সেই রাস্তা দিয়ে পারতপক্ষে যেতে আপনাদের বারণ করি। পায়ে হেঁটে ছাড়া সে পথে অন্য কোনো উপায়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু প্রোম-টাঙ্গুপের রাস্তায় গরুর গাড়ী চলে। টাঙ্গুপ থেকে সাম্পানে সোজা আকিয়াব যেতে পারবেন। আকিয়াবে গিয়ে আপনারা হয়তো জাহাজও পেতে পারেন চাটগাঁ কিম্বা কোলকাতা যাওয়ার। তবে যদি টাঙ্গুপের রাস্তা আর না-ই খোলে কখনো, তখন বাধ্য হয়ে মণিপুর রোড দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু আমার ফাইন্যাল চিঠি কিম্বা তার না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা মান্দালয়েই থাকবেন।

সিরাজ বলিল : বেশ, আপনার কথা মতোই কাজ হবে।

সিমজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাসিমুখে বলিলেন : তা হলে আমি এখন উঠি। আপনাদের যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে তো!

এখন আপনারা বরং একটু বিশ্রাম করুন সবাই। আর হ্যাঁ, একটা কথা খেয়াল রাখবেন, রাস্তায় যেন আপনাদের কেউ হঠাৎ বেরিয়ে না পড়েন—পুলিশে দেখতে পেলে কী যে অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটবে তা তো বুঝতেই পারছেন!

পর্দা ঠেলিয়া সিমজী সাহেব বাহির হইয়া গেলে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে সুরেশবাবু বলিলেন: লোকটা পূর্বজন্মে কোনো আপনার জন ছিল নিশ্চয়ই। দেখেছ কী চমৎকার ব্যবহারটি!

সিরাজ বলিল: পূর্বজন্মে কী ছিল বলে আপনার সন্দেহ হয়?

—মামা, নির্ঘাৎ মামা। অর্থাৎ আমার বাবার শ্যালক।

—ভদ্রলোক কথাটা শুনলে নিশ্চয় খুশি হবেন না। কিন্তু সত্যি, রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনগুলি আমার মনে পড়ছে:

পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই
মোর তরে সেথা আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
আমি তারে ফিরি খুঁজিয়া।

টেন্‌ডাউনজি হইয়া যখন প্রভাতের দল রেলযোগে পিনমনা পৌছিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গেছে। মান্দালয় যাইতে হইলে এই স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে। মেন লাইনের মধ্যে পিনমনা একটা বড় জংসন।

ট্রেন আসিবার সময় অনেকক্ষণই কাটিয়া গেছে। বিলম্ব সহিতে না

পারিয়া প্রভাত পায়চারী করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে প্ল্যাটফর্মের উপর। সুরেশবাবু, সিরাজ এবং তাহার স্বগ্রামবাসী ছোট দলটি মালপত্রগুলি আগলাইয়া বসিয়া প্ল্যাটফর্মের এক পাশে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। বিকাশ প্ল্যাটফর্মটার অপর প্রান্তে একটা ল্যাম্প পোস্টে ঠেস দিয়া চুরুট ফুঁকিতেছে উত্তরমুখী দাঁড়াইয়া। এই শীতের রাতে কড়া বর্মাচুরুট টানিয়া মৃদু-মধুর নেশা ধরিয়াছে তাহার। আর অলসগতিতে তাহার চিন্তাধারা চলিয়াছে ইতিহাসের পথ ধরিয়া...বিলাসপ্রিয় রাজা মিনডুন,—বর্মার শা'জাহান। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতালোভী কূটনীতিপরায়ণা রাণীর ষড়যন্ত্র সুরু হইয়া গেল। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রাখিতে হইবে তাহাকে। রাণীর চক্রান্তে একটির পর একটি গুপ্ত হত্যা চলিল। অবশেষে সিংহাসনে বসিল থেবো—রাণীর হাতের ক্রীড়নক অলস-ভীরু থেবো—বর্মার শেষ স্বাধীন রাজা।...কী কুক্ষণেই না মান্দালয়ে অবস্থিত ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে বর্মা-রাজের বিরোধ সৃষ্টি হইল। ইংরাজের জাত এই বিরোধীতা সহ্য করিবে কেন। সময় বুঝিয়া দাঁও মারিয়া বসিল। ভারতবর্ষে তখন ডাফরিনী আমল। প্যান্‌ডারঘার্‌স্টের নৌবহর ইরাবতীর উজান বাহিয়া মান্দালয়ে আসিয়া রণ-দামামা বাজাইয়া বসিল। কিন্তু আশ্চর্য, মান্দালয়ের সুরক্ষিত কেল্লা হইতে একটা তোপও প্রতিরোধের গর্জন জানাইল না! বর্মার প্রধান সেনাপতির এই মিরজাফরী বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীন বর্মার রাজধানী মান্দালয় অধিকৃত হইল। কেল্লার সাত সাতটি চূড়ায় উড়িয়া উঠিল এক একটি ইউনিয়ান জ্যাক। সোয়া বর্গমাইল জুড়িয়া যে প্রাসাদ-কেল্লা, মুহূর্তে তাহার নামান্তরও ঘটিয়া গেল—ডাফরিন ফোর্ট।—দুঃখের হাসি হাসে বিকাশ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় যে ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই যেন একটা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া গেছে বর্মায়!

ওদিকে অধৈর্য হইয়া প্রভাত স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসিয়া ঢুকিল।

অফিসঘরে বসিয়া স্টেশন মাস্টার কী লিখিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল এক সুন্দর বর্মী তরুণী। প্রভাত ধীর কণ্ঠে ইংরাজীতে বলিল: ক্ষমা করবেন, মান্দালয় যাওয়ার ট্রেনটা কী আজ আর আসবে?

উভয়েই চোখ তুলিয়া প্রভাতের দিকে তাকাইল। স্টেশন মাস্টার বৃদ্ধ বর্মী; মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন: দেখুন, রেঙ্গুনে বোমা পড়ার পর থেকে গাড়ী আসে নিজের মেজাজে। সময় অসময় বলে আর কোন কিছু নেই। আজ হয়তো আটটাই বেজে যাবে গাড়ী আসতে।—রসিক লোক স্টেশন মাস্টার। প্রভাতের লোকটিকে ভালো লাগিল।

বর্মী আধুনিকা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলিয়া প্রভাতের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিল। তারপর রঞ্জিত অধর দুটি ঈষৎ সিক্ত করিয়া হিন্দিতে প্রশ্ন করিল: আপনি মান্দালয়ে যাবেন বুঝি?

মেয়েটির প্রশ্নে এমন একটা কিছু ছিল যাহা প্রভাতের ভাল লাগিল না। সংক্ষিপ্ত ভাবেই সে উত্তর দিল: হ্যাঁ।—তারপর স্টেশন মাস্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: গাড়ীতে ইভ্যাকুইজদের ভিড় বোধকরি আজও খুব বেশী হবে, না?

—রেঙ্গুনে এত লোক কোত্থেকে যে এলো বুঝতে পারিনা। কত হাজার হাজার লোকই তো চলে গেল; কিন্তু যে ভিড় সে-ই ভিড়। ইঞ্জিন থেকে সুরু করে গাড়ীর ছাদে পর্যন্ত লোক উঠতে কসুর করেনি। হাতল ধরে ঝুলে ঝুলেই যে কত শত লোক গেল তার ইয়ত্তা নেই!

—আমাদেরও কী তেমনি ঝুলে ঝুলে যেতে হবে নাকি? তাহলে তো গেছি আর কী!

—ঝুলে যেতে না হলেও যে বসে যেতে পারবেন সে আশা খুব কম। বলিয়া স্টেশন মাস্টার হাসিলেন।

প্রভাত রীতিমত দমিয়া গেল। ধন্যবাদ জানাইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আর সেই সঙ্গে কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল বর্মী যুবতীটি। তাহার ছোট ছোট চোখ দুটি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। স্টেশন মাস্টারকে বর্মী ভাষায় কী যেন বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ধীর চরণে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি আসিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল মোহগ্রস্ত ভাবে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি যাহাকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে সে তখন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্তে অবস্থিত যাত্রীর ছোট দলটির দিকে।

অবশেষে ট্রেন আসিল রাত আটটা নাগাদ। প্রায় সব ক'টি কম্পার্টমেণ্টই প্যাসেঞ্জারে পরিপূর্ণ। প্রভাতের দল রীতিমত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের স্থান হইবে কিনা কে জানে! প্রভাত হাঁকিল: যে যেখানে পার উঠে পড়, এক সঙ্গে একই কামরায় যে যাওয়া যাবে না তা তো বুঝতেই পারছো।

মুহূর্তের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল দলটি। যে যেখানে পারিল উঠিয়া পড়িল। প্রভাত সিরাজকে সঙ্গে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটি স্বল্পালোকিত কামরার দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। কম্পার্টমেণ্টটি ফার্স্ট ক্লাস।

—অন্ধকারে কোথায় এসে উঠলে হে! এ যে ফার্স্ট ক্লাশ।

প্রভাত সহজ ভাবেই উত্তর দিল: রাখ তোমার ক্লাস ডিস্‌টিঙ্কসন্। ও সব বুর্জোয়া ব্যাপারে দুশ্চিন্তা এখন আর করা চলে না। তুমি মাথা বাড়িয়ে দেখতো সবাই উঠতে পারলো কিনা।—বলিয়া সে কুলিটির নিকট হইতে মালপত্রগুলি বুঝিয়া লইতে লাগিয়া গেল।

সিরাজ জনালার বাহির হইতে মুখ ভিতরে আনিতে আনিতে বলিল : সবাই উঠে পড়েছে। পাশের কামরায় সুরেশবাবু যেন কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছেন।—বলিয়া সে কামরাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল : কম্পার্টমেণ্টটা একেবারে যে খালি পড়ে রয়েছে দেখছি !

প্রভাত বিছানাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, সৌভাগ্য বলতে হবে। পথটা একটু নিশ্চিন্তে যেতে পারবো আশা করি।

কিন্তু নিশ্চিন্তে যাওয়ার আশাটা নিমেষের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল।—দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল সেই বর্মী তরুণীটি। কুলি বাঙ্কের উপর নবাগতার বেতের সুটকেশ আর বেডিংটি রাখিয়া তাহার প্রাপ্যের আশায় হাত পাতিল। বর্মিনী ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অপর পাশের বার্থটির কোণ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল সহজ নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গিতে।

সিরাজ মেয়েটির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে একটু অস্বস্তিই বোধ করিতে লাগিল : এ আবার কোত্থেকে এসে জুড়ে বসলো !

মেয়েটির হাব ভাব প্রথম দৃষ্টিতেই প্রভাতের খারাপ লাগিতেছিল। শকুনের মতো চোখ মেলিয়া কেমন ভাবে তাকায়—কোনো রকম স্পাই-টাই নয়তো ! গম্ভীর মুখে সে চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেছে। শীতের জমাট-বাঁধা কুয়াশার পর্দা চিড়িয়া ট্রেনখানি তখন ছুটিয়াছে পূর্ণ বেগে। ঠাণ্ডা বাতাসের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। বর্মী তরুণীটি বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গিতে বসিয়া রহিয়াছে। ট্রেনের সেড্‌যুক্ত আলোটি হইতে এক ঝলক আলো তাহার বক্ষদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া জানু পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার

যৌবনের বক্ররেখাগুলিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নীলাভ চোখ দুটির দিকে তাকাইতেই বিদ্যুৎচমকের মতো প্রভাতের মনে হইল, ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো সে দুটি চোখ যেন কামনায় তীক্ষ্ণ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সিরাজ ট্রেন ছাড়িয়া দিতেই বাঙ্কের উপরে উঠিয়া গিয়াছিল—বোধকরি ইতিমধ্যে ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে সে। প্রভাত পা ছড়ানো অবস্থায় হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট টানিয়া চলিয়াছে। সারা দুপুর সে ট্রেনে ঘুমাইয়া লইয়াছিল, সেই জন্যই হয়তো তখন পর্যন্ত ঘুম আসিবার নামটি করিতেছে না। বিনিদ্র চোখ মেলিয়া সে জানালার কাচের ভিতর দিয়া বাহিরের স্বচ্ছ আকাশের অতলান্ত গভীরতায় ডুবিয়া গেছে যেন। ম্লান জ্যোৎস্নালোক তাহার কাছে অর্থহীন বলিয়া মনে হইল। ভাবনার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে সে। তাহার চোখের উপর ঘনাইয়া উঠিতেছে অন্ধকার! জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাতেই শুধু এই অন্ধকারটুকুই তো সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। ক্রূর নিয়তি তাহাকে চিরকাল আলোর স্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কৈশোরের স্বপ্ন-সৌধ দুর্ভেদ্য ঘন-তমিস্রার অন্তরালে পড়িয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছে প্রেতপুরীতে। হতাশার অন্ধকার তাহার চোখের সম্মুখে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াই তো তাহাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো দেশান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। নিষ্ঠুর ভাগ্যের তাহাতেও আক্রোশ মিটিল না! যে ক্ষীণতম আলোর রেখাটুকু তাহার জীবনের চক্রবালে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাও নিমেষের মধ্যেই আবার অন্ধকারেই তলাইয়া গেল। তাহাকে রেঙ্গুন ছাড়িয়া আসিতে হইল! ইহা সত্ত্বেও তাহাকে চলিতে হইবে। চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়াই সে চলিবে। হয়তো বা চলতি পথে কোন এক শুভলগ্নে আলোর শিখা তাহার সম্মুখে নাচিয়া উঠিবে—হয়তো

বা উঠিবেনা। আর না উঠিলেই বা কী; তাহার পৌরুষ তো পরাজয় কোনদিনও স্বীকার করিবে না।...প্রভাত দগ্ধ সিগারেটটি ছুঁড়িয়া ফেলিবার জন্য জানালার কাচটি খুলিয়া দিল।

এই সুযোগে মেয়েটি কথা পাড়িয়া বসিল: আপনারও দেখছি আমারই মতো ট্রেনে ঘুম আসে না। এ একটা বেয়াড়া অভ্যাস, কি বলেন?

এ ধরণের অযাচিত ভাবে মেয়েটির আলাপ করিবার চেষ্টা প্রভাতের ভাল লাগিল না। সে উদাসীনের মতোই বলিল: ট্রেনে আমার ঘুম হয় না এমন একটা খবর আপনাকে কে দিলে? গাড়ীতেই বরং ঘুমটা আমার ভাল হয়।

মেয়েটি ধীর কণ্ঠে বলিল: ও, তা হবে; কিন্তু আমার ট্রেনে বসে দোলা খেতে খুব ভাল লাগে,—ঘুমটা কিছুতেই আসতে চায় না।

প্রভাত কিছু জবাব দিল না। মেয়েটি তেমনি শান্ত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল,—আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—প্রোম।

—ওখানেই থাকেন বুঝি?

—না, রেঙ্গুন ইভ্যাকুইজ আমরা।

—আমিও তেইশের পর রেঙ্গুন ছেড়ে এসেছি। মান্দালয়ে আমাদের বাড়ী—যাওয়ার মুখে একবার এখানে আমার মাসীর বাড়ীতে উঠে ছিলাম।

মেয়েটি পা গুটাইয়া বসিল। তারপর গ্রীবাখানি ঈষৎ হেলাইয়া বলিল: আপনি তো বাঙালী—বাঙালীরা চমৎকার লোক। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা তীব্র বাসনা আমার বরাবরই আছে। সত্যিকথা বলতে কি, আজ আপনাকে দেখে আলাপ করবার ইচ্ছাটা এতই প্রবল হয়ে উঠলো যে, আপনাদের বিরক্ত করতে একই কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়েছি।

মেয়েটির কথাগুলির মধ্যে একপ্রকার নির্লজ্জতা। প্রভাত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিল। সে কোন কথা বলিল না। বাহিরের পানে আবার সে তাহার দৃষ্টি মেলিয়া দিল: নির্মেঘ আকাশ। পশ্চিম দিগন্তে একখণ্ড বাঁকা চাঁদ; কুয়াশার মায়াজালে ঢাকা। স্তিমিত আলোকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর রহস্যাতুর। দূরের আলো-আঁধারে মেশা অস্পষ্ট দিগন্ত রেখাটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়াই রহিল প্রভাত। এক উদ্দাম চিন্তার স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে...নারী! কী ঘৃণাই না সে করে ইহাদের। তাহার জীবনের চরমতম বেদনা বহিয়া আনিয়াছে এই নারী। ধূমকেতুর মতো তাহার জীবনাকাশে ভাসিয়া উঠিয়া আবার সে মিলাইয়া গেছে;—পিছনে রাখিয়া গেছে শুধু প্রচণ্ড হাহাকার আর দুঃসহ মর্মবেদনা। তাহার আবেগ-চঞ্চল মনটিকে নারীই তো জড়-অচেতন করিয়া গেল পিষিয়া দলিয়া।... প্রভাতের মগ্ন চৈতন্যলোক হইতে ধীরে ধীরে কতকগুলি এলোমেলো স্মৃতির টুকরা জাগিয়া ওঠে। শনিবারের সেই সন্ধ্যা! 'রোমিয়ো জুলিয়েট' দেখিতে গিয়াছিল তপতী আর সে। ট্র্যাজেডির সকরুণ পরিসমাপ্তি তাহার চোখ দু'টি অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছিল। তপতী তাহা লক্ষ্য করিয়াই প্রভাতের কানের কাছে মুখটি আনিয়া হাসিতে হাসিতে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়াছিল: হোয়াট্ এ সিলি সেন্টিমেণ্ট্যাল ম্যান ইউ আর!...সে আর একদিনের কথা।—দোলপূর্ণিমার রাত। প্রভাত বাড়ীর সম্মুখের ছোট্ট লনটিতে বসিয়াছিল আর তাহার সম্মুখে বসিয়া তপতী একটি হোলী গানের সুর ভাঁজিতেছিল মধুর মৃদু কণ্ঠে। কিছুক্ষণ পরে সুযোগ বুঝিয়া প্রভাত উচ্ছ্বসিত ভাবে বিবাহের প্রস্তাব করিলে তপতী উদাসীন কণ্ঠেই বলিয়াছিল,—ভালবাসাটাকে বিয়ের গণ্ডিতে না বাঁধলে কী চলে না প্রভাত? তোমার আধুনিকতার কিন্তু প্রশংসা করতে পারছি না।

সত্যিই সে বিবাহের গণ্ডিতে কোনদিনও বাঁধা পড়ে নাই। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রভাতের আবেগময়ী প্রেমের উৎসটি উৎসারিত হইয়াছিল সে তাহাকে নির্মমভাবে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। প্রেমের কোন নৈসর্গিক মহত্ত্বই সে স্বীকার করিতে পারে নাই। আর পারিবেই বা কী করিয়া; যাহারা কামনার ঈগল-চক্ষু মেলিয়া শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, ইন্দ্রিয়-বাসনার পরিতৃপ্তির আশায় তাহারা শুধু প্রেমের অভিনয়ই করিতে জানে। বিক্ষিপ্ত ভোগ-লালসার বহ্নিশিখায় তাহারা নিজেরাও যেমন পুড়িয়া মরে; তেমনি যে-হতভাগ্যের দল তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহাদেরও মারিয়া যায়। তপতীর স্মৃতি একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতোই তাহার জীবনটিকে বিরস এবং প্রাণহীন করিয়া রাখিয়াছে। আজ তাই কোন নারীর প্রতিই তাহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই—কেবল ঘৃণাই রহিয়াছে তাহাদের জন্য সঞ্চিত।—ঘৃণা, শুধু ঘৃণা। আজিকার এই সহযাত্রিনী—অবিশ্বাসিনী ভোগ-বিলাসিনী নারীদেরই আর একজন!...প্রভাতের চোখ দুটি প্রখর হইয়া ওঠে। তাহার মুখ দিয়া একটা কম্পিত অস্পষ্ট স্বর নিজের অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া আসে: Those wretched vultures!

বর্মী তরুণীটি এতক্ষণ প্রভাতের আলো-ছায়া-লাগা সুন্দর মুখের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়াছিল। একটা ঢোক গিলিয়া আবার সে মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: আপনারা কী মান্দালয় যাচ্ছেন?

প্রভাত মুখ না ফিরাইয়া বলিল: হ্যাঁ।

—মান্দালয় আপনাদের খুব ভাল লাগবে বলেই আমার মনে হয়। চমৎকার জায়গা কিনা! তা এবার থেকে বোধ হয় ওখানেই থাকবেন?

—না।

—তবে?

—প্রোম-টাঙ্গুপ-পাশ না খোলা অবধি হয় তো থাকবো।

—মান্দালয়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন ভেবেছেন?

—জানা শোনা লোক আছে।

—যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাড়ীতে নিঃসঙ্কোচে আপনারা থাকতে পারেন। অতিথি সেবার কোনো ত্রুটি হবে না।—তাহার কণ্ঠে কেমন যেন একপ্রকার আগ্রহের রেশ বাজিয়া উঠিল।

—ধন্যবাদ; তার কোনো প্রয়োজন হবে না।

—না, না, কোনো সঙ্কোচ করবেন না, অনুগ্রহ কোরে আমাদের কুটীরে পদার্পণ করলে বড্ড খুসী হব।

—ক্ষমা করবেন, আপনার অনুরোধ রাখতে পারবো বলে তো মনে হয় না।

—তা হলে কথা দিন, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে অন্তত বেড়াতে আসবেন।

—চেষ্টা করে দেখবো।

—চেষ্টা নয়, আপনাকে আসতেই হবে। বলুন আসবেন।—মেয়েটি ঘনিষ্ঠ হইতে চায়।

—ওই তো বললাম, চেষ্টা করবো।—বিরক্ত হইয়া উঠিল প্রভাত: আমার মাথাটা ধরেছে; এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে।—কথাগুলি তাহার একটু কর্কশই শোনাইল।

মাথা ধরেছে! বলতে হয়।—বলিয়াই মেয়েটি উঠিয়া তাহার এটাচী হইতে একটা ছোট্ট শিশি বাহির করিল এবং পলক ফেলিতে না ফেলিতে প্রভাতের সিটের পাশে আসিয়া ব্যস্তকণ্ঠে কহিল: 'বাম' রয়েছে, একটু মালিশ করলেই সেরে যাবে মাথাধরাটা।

একটা মিথ্যার দোহাই দিয়া প্রভাত মেয়েটির উৎপীড়ন হইতে

অব্যাহতি পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল; কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল দেখিয়া সে নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ত্রস্তজড়িত কণ্ঠে সে বলিল: ধন্যবাদ, মালিশের কোনো প্রয়োজন হবে না। আপনি কেন বৃথা কষ্ট করছেন?

—কষ্ট কিসের! আপনার দেখছি বড্ড সঙ্কোচ।—বলিতে বলিতে সে প্রভাতের পাশেই বসিয়া পড়িয়া তাহার কপালের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

প্রভাত শশব্যস্তে পা গুটাইয়া একটু সরিয়া বসিল। নিতান্ত উত্তেজিতই হইয়া উঠিল এবার। অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া সে কহিল: একটু ঘুমুতে পারলেই সামান্য মাথাধরাটা সেরে যাবে। মালিশ-টালিশের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি দয়া কোরে আপনার সিটে গেলেই আমি খুশী হব।

হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল মেয়েটির চোখে মুখে। ঝিক মিক করিয়া উঠিল তাহার শুভ্র সুন্দর দাঁতগুলি। সহজ শান্ত কণ্ঠে সে বলিল: বেশ, আপনি তাহলে একটু ঘুমোন।—বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার সিটে গিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর মখমলের থলিটা হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইল। আলগাভাবে দু' চারটি টান দিয়া সে বিছানার গায়ে এলাইয়া দিল নিজেকে। তাহার নীল হিংস্র চোখ দুটি স্নিগ্ধ হইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। আর তাহার উন্নত বক্ষে ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন জাগিয়া উঠিল সমুদ্র-তরঙ্গের দোলা।

বাহিরের খণ্ড চাঁদটি তখন দূর কালো পাহাড়ের অরণ্যশিখরে ধীরে ধীরে অস্তে নামিয়া চলিতেছে।

চার

মান্দালয়।

উত্তর ব্রহ্মের এই সহরটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রাচীনতার দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বহুকাল ধরিয়া ইহা ব্রহ্ম-রাজরাজড়াদের রাজধানী ছিল। অতীতের গৌরবময় কীর্তি বহুলাংশে এখনও মহাকালকে উপেক্ষা করিয়া সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে। বৌদ্ধ মৃৎশিল্প এবং ব্রহ্মের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলি বুকে করিয়া মান্দালয় অর্বাচীন সহরগুলির প্রতি যেন বিদ্রূপের কটাক্ষই হানে। এ দেশের চারু-শিল্প-কলা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া আসিতেছে মান্দালয়কেই কেন্দ্র করিয়া। সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যকলার আদি পীঠস্থান বলিয়াও এ সহরটির আকর্ষণ কম নয়; বর্তমান শতাব্দীতেও তাঁতশিল্প মান্দালয়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যবসা। কাঠের ব্যবসার জন্যও সহরটির প্রসিদ্ধি আছে। অধুনা বহু সুরাটী এবং সিন্ধি ব্যবসায়ীর দল সহরের সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।

মান্দালয়ের পশ্চিম দিকে ইরাবতী প্রবাহিত। প্রাচীন বন্দরের ভগ্নাংশ এখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে ইহার তীরে ছড়ানো;—অনুসন্ধিৎসু চোখে তাহা সহজেই ধরা পড়ে। সহরের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে সোয়া বর্গ-মাইল জুড়িয়া বর্মার স্বাধীন রাজাদের প্রাসাদ-কেল্লা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে শুধু ইহাই কোনো প্রকারে ধ্বংশের হাত হইতে

নিষ্কৃতি পাইয়া গিয়াছিল। প্রসাদ-কেল্লা ঘিরিয়া সুপ্রশস্ত জলপূর্ণ পরিখা,—পদ্ম আর শালুকের বন। কেল্লার উত্তর দিকে—সহরের উত্তর উপকণ্ঠে বন্ধুর উপত্যকা। তাহারই গায়ে প্রসিদ্ধ গগনস্পর্শী 'আরাকান প্যাগোডা'। প্যাগোডার অনতিদূরে 'মান্দালয় চণ্ড্'—বৌদ্ধ ধর্মশালা বিশেষ। আর তাহারই পাশে একটা ছোট পাহাড়ের উপর বর্মী-বৌদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড য়ুকান্তির বিরাট প্রাসাদ। সহরের মধ্যে এই অঞ্চলটুকু রূপকথার দেশের চাইতেও বোধকরি সুন্দর।

আজ এক পক্ষকালেরও অধিক হইল প্রভাতেরা মান্দালয়ে আসিয়াছে। কর্মহীন অলস মুহূর্তগুলি কোন প্রকারেই যেন কাটিতে চায় না। আহার এবং নিদ্রা—এ'দুটি কাজ ব্যতীত তাহাদের কী-ই-বা আর করিবার আছে। প্রথম কয়েকদিন পথে পথে ঘুরিয়া সহরের অসংখ্য সুন্দর প্যাগোডাগুলি দেখিয়া বেড়াইতে তাহাদের ভালই লাগিত। ইদানীং তাহাও আর তেমন ভাল লাগেনা। সারাক্ষণ ঘরে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে রীতিমত হাঁপাইয়া উঠিয়াছে তাহারা।

সেদিন অপরাহ্ণে চায়ের পর্বটা শেষ করিবার পর সুরেশ বাবু এবং সিরাজ দাবা লইয়া বসিয়া গেলেন—বোধকরি ধৈর্যের একটা অগ্নিপরীক্ষাই দিতে চান তাঁহারা। বিকাশকে দেখা যাইতেছে না। ইতিহাসের লোক সে। হয়তো প্যাগোডা কিম্বা কেল্লার চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফিরিতেছে। পাশের রুমটি হইতে দলের অপর কয়েকজনের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে—দল বাঁধিয়া বেড়াইবার জন্য বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে নিশ্চয়ই। প্রভাতের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কাউচটার উপর গা এলাইয়া সে সিগারেট টানিয়া চলিয়াছে।

কী ভাবিয়া প্রভাত হঠাৎ উঠিয়া পড়িল। ওভারকোটটা কাঁধে

ফেলিয়া বলিল : ঘরে আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়, একটু ঘুরে আসা যাক্। বেরুবে নাকি তোমরা কেউ?

সুরেশবাবু এবং বিকাশের অখণ্ড মনযোগ তখন ছকৃটির উপর নিবদ্ধ। প্রভাতের কথাগুলি তাহাদের কর্ণগোচর হইলনা বলিয়াই কিনা কি জানি কোন উত্তরই দিলনা তাহারা।

প্রভাত বলিল : তবে আমি একাই চললুম ;—রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছি বসে থাকতে থাকতে।—বলিয়া সে পর্দা ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সহরের উত্তর পূর্ব প্রান্তবর্তী সেই প্রাসাদ-কেল্লা ঘিরিয়া যে সুপ্রশস্ত পরিখা—তাহারই পাশ দিয়া বৃত্তাকারে চলিয়া গেছে 'কেল্লা রোড'। রাস্তাটির একধারে একটা বনঝাউ গাছের নিচে আসিয়া প্রভাত বসিয়া পড়িল। সারাটা পথ হাঁটিয়া আসার দরুণ একটু ক্লান্তিই বোধ করিতেছিল সে।

সান্ধ্য-গোধূলির ম্লান আলো সারা সহরটির বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখন। অদূরবর্তী 'আরাকান প্যাগোডা'র গগনচুম্বী চূড়াটির উপর পশ্চিমাকাশের বর্ণবৈচিত্রের প্রতিফলিত আভা। সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে প্রভাতের মনটি কেমন যেন উদাস হইয়া উঠিল।

—চিনতে পারছেন?

মুহূর্তে চেতনা ফিরিল প্রভাতের। মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল : আপনি!

মেয়েটি মৃদু-হাসিয়া বলিল : চিনতে পারছেন তাহলে! আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু কই, আপনি কথা দিয়ে তো একদিনও গেলেন না আমাদের বাড়ীতে!

—কী করে যাই বলুন, সেই যে আপনি মান্দালয় স্টেশনে আমাকে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলেন, সেটা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। আপনার অনুরোধটা তাই রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মেয়েটি তেমনি সহজভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিল: আপনি দেখছি নিতান্ত আত্মভোলা। যাক, আমাকে নিশ্চয়ই আর নতুন কোরে ঠিকানা লিখে দিতে হবে না—আজ যাচ্ছেন আশাকরি।

—আজ! কিন্তু আজ তো কিছুতেই যেতে পারবোনা। বাড়ীতে এক্ষুনি ফিরতেই হবে। কতকগুলো জরুরী চিঠি লেখা বাকী আছে। বড্ড একঘেয়ে লাগছিল বলেই কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলাম।

—একঘেয়েই যখন লাগছে তখন একটু বৈচিত্রের দরকার নয় কী? আজ আর চিঠি না-ই বা লিখলেন। একদিনের দেরীতে এমন বিশেষ কিছু এসে যাবেনা।

—না, আমার পক্ষে আজ যাওয়া সম্ভব নয়। কাল পরশু নাগাদ বরং আপনাদের ওখানে একবার যাব, কথা দিচ্ছি।

—কথা তো এর আগেও দিয়েছিলেন। আজ কোনো আপত্তিই আমি শুনবোনা। ওই আমার মোটর রয়েছে, চলুন।

প্রভাত বিব্রত হইয়া পড়িল: আজ আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ঠিকানাটা দিন, কাল কিম্বা পরশু নিশ্চয়ই যাব।

মুহূর্তে মেয়েটির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল: বেশ, এবার আপনাকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আমার ঠিকানা নেওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনার ঠিকানাটাই বরং আমায় দিন;—আমি গাড়ী পাঠাব আপনাকে আনতে।

প্রভাত এইবার রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে কী যেন ভাবিয়া লইয়া সে কহিল: সুরাটী মসজিদের দুটো বাড়ী পরে

প্রকাণ্ড যে দালানটা রয়েছে, সেখানে খোঁজ করলেই আমাকে পাবেন। —বলিয়াই সে ব্যস্ততাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল: আচ্ছা, আজ তাহলে আসি, আবার তো দেখা হবে।—কথা শেষ করার অপেক্ষামাত্র, অমনি সে আগাইয়া চলিল হন্ হন্ করিয়া।

আর পরক্ষণেই মেয়েটির চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল কৌতুকের হাসি।

প্রভাত ভুল ঠিকানাটা দিয়া আত্মপ্রসাদই বোধ করিতেছিল হয়তো। নিরুদ্বেগে সে সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাঁটিয়া চলিল।

কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া একখানা মোটর পিছু পিছু আগাইয়া আসিতেছিল ধীর মন্থর গতিতে।

তারপরে কয়েকদিন কাটিয়া গেছে। প্রভাত ইদানীং বড় একটা ঘরের বাহির হয়না। সে ভাবিয়া কূল পায়না কী করিয়া মেয়েটি তাহার ঠিকানাটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় সেই সুরাটী মস্‌জিদ আর কোথায় বা বাজার রোডের শেষ প্রান্ত। মাইলেরও অধিক ব্যবধান। সেদিন দু' দু'বার ড্রাইভার আসিয়া তাহার খোঁজ করিয়া গেছে। বাড়ীতে নাই বলিয়া একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা খবর পাঠাইয়া ড্রাইভারকে ফিরাইয়া দিয়াছে সে। কিন্তু ফিরাইয়া দিলে কী হয়; তাহার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেছে—পথে একবার বাহির হইলেই মেয়েটির সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যাইবে। এক ধরণের আতঙ্ক তাহাকে মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি দিতেছে না। ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে দম আটকাইয়া আসে তবু বাহির হইতে তাহার ভরসা হয় না।

সেদিন রবিবার।

কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রভাত উন্মুক্ত বারান্দায় পায়চারি করিতেছে ওভারকোটের পকেটে হাত রাখিয়া। তাহার কপালে চিন্তার সর্পিল রেখা-চিহ্ন। মান্দালয় তাহার কাছে বনবাসের মতো মনে হয়। গত ৯ই হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রোম-টাঙ্গুপের পাশ নাকি গভর্নমেণ্ট খুলিয়া দিয়াছিল—সিমজী চিঠি দিয়াছেন। যথাসময়ে তার করিয়া এই সংবাদটুকু দিলে তাহারা সেই সুযোগে হয়তো পার হইয়া যাইতে পারিত। সিমজীকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলিয়া মনে হয় প্রভাতের। যে-সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে তাহারা, সে সুযোগ আর আসিবে কিনা কে জানে। সুযোগ আসুক বা না আসুক, অনিশ্চিতের মতো মান্দালয়ে থাকিতে পারিবেনা সে। না—না, কিছুতেই আর এখানে থাকিবেনা। কাল,—আগামী কালই অন্য কোথাও গিয়া সে অপেক্ষা করিবে। এমন কি প্রোমে গিয়া শঙ্কিত জীবন যাপন করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু মান্দালয়ে কিছুতেই আর থাকিবেনা—আর একদিন থাকিলেই সে নিশ্চিত পাগল হইয়া যাইবে।.....দুঃসহ অসহায়তাবোধ এবং তীব্র মানসিক ক্লান্তি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাত সিগারেট ধরাইবার জন্য প্যাকেট বাহির করিল। সিগারেট ফুরাইয়া গেছে। অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল সে।

মৃত্যুমগ্ন নিষ্প্রদীপ সহর। বাজার রোডের রূপ বদলাইয়া গেছে। প্রভাত সিগারেট কিনিবার উদ্দেশেই হয়তো ওই মোড়ের দোকানটির দিকে আগাইয়া চলিল। এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়া আপন খেয়ালেই সে যখন বাসার দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে তখন নিমেষের মধ্যে কোথা হইতে একটি তরুণী হাসিমুখে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্তে প্রভাতের সকল ভাবনার জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল: আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। আজ আর আপনার যেতে কোনো আপত্তি হবেনা নিশ্চয়ই।—মেয়েটির কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইল।

—কিন্তু এ অসময়ে!

—বলেন কি! এ-অসময়ই তো পরম শুভ মুহূর্ত। অনেক সাধনার পর যখন আপনার দর্শন পেয়েছি তখন আপনাকে আমার কুটীরে পদার্পণ করতেই হবে আজ।

—আপনার সাধনা অপূর্ণ বলে যদি আমি না যাই।—নিরুপায় প্রভাত সহজ হইবার চেষ্টা করিল।

—তাহলে পথ আগ্‌লে দাঁড়াবো।

—পথ আগ্‌লে দাঁড়াবেন?

—হ্যাঁ, সহজ কথায় চীৎকার করবো—হৈ চৈ বাধাবো।

—তাতে কী হবে?

—রাতে পথে ঘাটে কোনো মেয়ে চীৎকার করলে কী হয় আপনি জানেন না?

প্রভাতের সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল—কথাটা শুধু ঠাট্টা বলিয়া মনে হইল না। এ-মেয়ে যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে। তাহাকে লইয়া কী করিতে চায় কে জানে, কিন্তু মরিয়া হইয়া এ বিড়ম্বনা মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে। লঘু কণ্ঠে সে বলিল: এ অসময়ে বাড়ীতে তো নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কী রেঁধেছেন যে খাওয়াবেন? বাঙালী মানুষ আমরা, শুধু ডাল-ভাতের প্রত্যাশী।

মেয়েটি প্রভাতের এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হইয়া গেল। মেলিয়া সেও হাসিতে হাসিতে জবাব দিল: কেন, একদিন

আমাদের বাড়ীতে নাপ্পি খেয়ে দেখলে দোষ কি। কিন্তু ভয় নেই, অতিথির যথাযথ সেবার কোনো ত্রুটি হবেনা। আসুন, ওই মোড়ে মোটর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

নিষ্প্রদীপ পথ বাহিয়া মোটরখানি চলিতেছে। বর্মী তরুণীটি প্রভাতের মুখের কাছটিতে মুখ আনিয়া আবেগময় মৃদু কণ্ঠে কহিল,—কী কষ্টই না দিলেন আপনি! ক্রমাগত আজ সাতদিন ধরে দুয়োর আগ্‌লে বসে আছি বললেই চলে; কিন্তু যাকে চাই তার দেখা নেই। এমনি কোরে মেয়েদের কষ্ট দিতে কী পুরুষদের ভদ্রতায় বাধে না? কী নিষ্ঠুরই না আপনি!—বলিয়া সে তাহার মুখখানি প্রভাতের বুকের উপর এলাইয়া দিল। তাহার বুভুক্ষু রক্তিম অধর দুটিতে কাঁপন লাগিয়া গেল। কামনার উচ্ছ্বলতায় বিভোর হইয়া উঠিল তাহার মদির নয়ন দুটি।

আর প্রভাত?

জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই তো সে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। আজ রাত্রে ও যদি একটা অতি কুৎসিত লালাসাতুর দিকের সহিত পরিচয় করিতেই হয়, তাহাতে সে পিছাইবে না। অভিজ্ঞতার এই সত্যটাকেও সহজভাবেই গ্রহণ করিবে। মেয়েটির প্রতীক্ষাতুর মুখের উপর মুখখানি সে নামাইয়া দিল, বর্মিণীর দেহ-বল্লরী তাহার বাহু-বন্ধনে থরথর করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সাঁ করিয়া মোটরখানি তখন মার্সডেন স্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়া সোজা চলিয়াছে।

আরো কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

পুতুল লইয়া খেলা যাহাদের অভ্যাস তাহারা নিত্য নতুনের সন্ধান করিয়াই ফেরে। হয়তো সেই কারণেই প্রভাতের উপর হইতে তাহার দৃষ্টিটা সরিয়া গেছে,—কিন্তু সরিয়া গেছে কী? প্রভাত আশ্বাস পায় না; উপযাচিকা যে সে যে-কোন মুহূর্তেই তো আসিয়া তাহার নির্লজ্জ দাবী পাড়িয়া বসিতে পারে। তাহার অসভ্য যৌবনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল জ্বলিয়া উঠিতেই বা কতক্ষণ!

অবশেষে একদিন আসিল যেদিন একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল প্রভাত। তাহার সকল উৎকণ্ঠার অবসান হইয়া গেল—সিমন্ডী সাহেব তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী। বেলা তিনটার দিকে সিরাজ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘরখানিকে মাতাইয়া তুলিল: তার এসেছে প্রভাত, তার এসেছে! কাল থেকে টাঙ্গুপের রাস্তা খোলা হবে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর সেই যে সকলে লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, তখনও পর্যন্ত তাহাদের দিবানিদ্রায় ভাঙ্গন ধরিতে সুরু করে নাই। সিরাজের আনন্দ-বিহ্বল উচ্চ কণ্ঠে সকলেই হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সুরেশবাবু প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, এঁ্যা কী বললে! সহজে যে বিশ্বাস হচ্ছেনা—কথাটা আর একবার বল ভায়া, ভাল কোরে শোনা যাক্।

সিরাজ সুর করিয়া আবৃত্তি করিল:—

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেছে
ওগো উঠেছে।
সারা রাতি চোক্ষে আমার
ঘুম যে টুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে

অকূল জলের অট্টহাসিতে

কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে

এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে

মুহূর্তের মধ্যেই পাশের রুমটি হইতে ফিরদৌস, কালু সওদাগর, রহমৎ, হাবিব, বৃদ্ধ মিয়াজান প্রভৃতি সকলেই ছুটিয়া আসিল। অধীর আনন্দে তাহারা কী যে করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বৃদ্ধ মিয়াজান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চট্টগ্রামী ভাষায় বলিয়া উঠিল,—আহ্, বাঁচালে খোদা! তোমার দরবারে হাজার সালাম।

বহুদিনের প্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দ-বোধ প্রভাতের মনে এত গভীর এবং ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার মুখের ভাষা স্তব্ধ হইয়া গেল। সিরাজ প্রভাতের চৌকির উপর বসিয়া টেলিগ্রামখানি তাহার সম্মুখে রাখিতে রাখিতে বলিল: এর চাইতে সুসংবাদ তোমার কাছে আর কী হতে পারে। পিশাচীর দুশ্চিন্তা থেকে এবার তো মুক্তি পাবে।

প্রভাত ধীর কণ্ঠে বলিল,—সেই তো আমার চরম সান্ত্বনা সিরাজ।

অপর পাশ হইতে সুরেশবাবু বলিলেন,—আজ চায়ের ব্যবস্থাটা একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে বলে দাও সিরাজ—চল শেষবারের মতো মান্দালয় প্যাগোডাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করে আসি।

—ব্র্যাভো, হোয়াট্ এ্যান আইডিয়া—বিকাশের কণ্ঠে আনন্দের উল্লাস ধ্বনিত হইল।

সিরাজ হাঁকিয়া বলিল: বয়, বয়, জল্‌দি চা বানাও।

প্রভাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল: আজ আমি নির্ভয়ে তোমাদের সঙ্গে বেরোতে পারি।

সৌন্দর্যের স্বপ্নপুরী মান্দালয়ের উত্তর উপকণ্ঠ। ছোট ছোট শ্যামল পাহাড়—তাহারই একটির গায়ে বহু রত্ন ভূষিত আকাশস্পর্শী প্যাগোডা। ইহার অভ্যন্তরে সোনার বেদীর সম্মুখে ধ্যানী বুদ্ধের মর্মর মূর্তি। চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরে খচিত মণিমাণিক্য হইতে বিচ্ছুরিত আলোর ঝিকিমিকিতে মন্দিরের অন্তরটি, চিরোজ্জ্বল। প্যাগোডার অনতিদূরে প্রসিদ্ধ 'মান্দালয় চঙ্'—তীর্থযাত্রীদের কোলাহলে সর্বদাই মুখরিত। গৈরিক বসনধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবিরত আসা-যাওয়া চলে এখানে। বাদ্য এবং সঙ্গীতে মাঝে মাঝেই ঝাঁকাইয়া ওঠে ইহার প্রাঙ্গনস্থিত নাট-মণ্ডপটি। বর্মী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মযাজকের প্রসাদটিও মান্দালয় চঙের পার্শ্ববর্তী একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। দূর হইতে ইহাকে রূপকথার রাজপুরী বলিয়া ভুল হয়।

প্যাগোডায় যাইবার যে-রাস্তা তাহা পাহাড়টির পাদদেশ হইতে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে। এই রাস্তার মাঝে মাঝে বিশ্রামের উপযুক্ত করিয়া ধাপ কাটা। ধাপ গুলির ধারে ধারে বর্মী তরুণীদের ভিড়—কেহ কেহ ফুল বিক্রয় করে, কেহ বা করে পানীয় বিতরণ।

পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা-নামা করিয়া প্রভাতের দল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্যাগোডা হইতে যখন তাহারা নামিয়া আসিল তখন একান্তভাবেই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিল সকলে। পাহাড়টির পাদদেশে একটি সুন্দর পুষ্পকুঞ্জের পাশে আসিয়া বসিল

প্রভাত, সিরাজ, বিকাশ, সুরেশবাবু এবং বৃদ্ধ মিয়াজান। দলের অন্যান্যরা তখনও নামিয়া আসে নাই—সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্যই বোধ হয় তাহারা উপরেই রহিয়া গেছে।

প্যাগোডা হইতে তখন ভাসিয়া আসিতেছে গঙের ধ্বনি—সন্ধ্যারতির পূর্ব সঙ্কেত। দলে দলে লোক উপরের দিকে উঠিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। অনতিদূরে একজন যুবক এবং একজন যুবতীকে আসিতে দেখা যাইতেছে। যুবকটির হাতে এক তোড়া ফুল; পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবী, একখানা দামী শাল কাঁধ হইতে জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে। সঙ্গের যুবতীটি বর্মী—বিচিত্র সুন্দর বেশ-ভূষায় তাহার দেহ-বল্লরী আবরিত, বিচিত্র বর্মী ছাতা তাহার মাথার উপর শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্যই যে তাহারা আঁকাবাঁকা পথটি ধরিয়া এদিকে আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু যুবকটি আর বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারিল না। প্যাগোডা হিল্‌সের পাদদেশে যে শ্যামল কুঞ্জটিতে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়াছিল তাহারই পাশে আসিয়া সে অকস্মাৎ থামিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল তাহার চোখে মুখে। ধীরে ধীরে সে আগাইয়া আসিয়া বলিল: আপনারা কি বাঙালী?

প্রভাতেরা তখন ফ্ল্যাস্ক হইতে কফি বাহির করিয়া তাহারই সেবায় ব্যস্ত। এই অপরিচিতের দেশে বাঙালীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া তাকাইল। সুরেশবাবু উত্তর দিলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ।

যুবকটি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: আপনারা বুঝি এখানেই থাকেন?

—আজ্ঞে না; রেঙ্গুন ইভ্যাকুইজ আমরা—বোমার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।—সুরেশবাবু উত্তর দিলেন।

—ও; এখানে কদিন হল এসেছেন?

—মাসখানেকের ওপর। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আর এখানে থাকবার প্রয়োজন হবে না। টাঙ্গুপের রাস্তা খুলে দিয়েছে—কালই যাব প্রোম।

—টাঙ্গুপের রাস্তা! সে-রাস্তা দিয়ে কোথায় যাবেন?

—জাপানীরা যখন বর্মায় থাকতেই দেবে না তখন আর যাব কোথায় —ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাব। কিন্তু মনে কিছু করবেন না; আপনাকে বর্মার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু যেন উদাসীন বলে মনে হচ্ছে। সে ভাল,—নির্লিপ্ত থাকতে পারলে আমাদের মতো দুর্ভোগ সইতে হবে না।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবে শুনিয়া যুবকটি পলকে কেমন যেন উদাস হইয়া উঠিল। সুরেশবাবুর শেষের কথাগুলি তাহার কানে ঢুকিল না।

যুবকটি অভিভূত কণ্ঠে বলিল: কী বললেন? দেশে ফিরবেন!

—এতে বিস্মিত হবার কী আছে। এই বিদেশে বিভুঁয়ে প্রাণ খোয়াতে আমরা রাজী নই। বাঙালী মানুষ—মরতে হলে বাঙলার মাটিতেই মরবো। নয়তো কী এই মগের মুল্লুকে—তৌবা!

যুবকটির মুখখানির উপর ভাসিয়া উঠিল কিসের যেন একটা কালো ছায়া। সে শান্ত করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: অনেকেই বোধ হয় দেশে ফিরে গেছেন ইতিমধ্যে?

—যারা সুযোগ পেয়েছে তারা তো গেছেই; আর যারা এখনো যেতে পারেনি তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। টাঙ্গুপের রাস্তাটা যখন খুলেছে তখন আর কারো টিকিটিরও নাগাল পাওয়া যাবে না।

সিরাজ হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল: কিন্তু, আপনি,—আপনার তো কোনো পরিচয় পেলাম না।

—আমার এমন বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। সামান্য টুরিস্ট আমি। সম্প্রতি এখানে এসেছি।

—কিন্তু এ দুঃসময়ে টুর করছেন ?

—জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার অনেক আগেই কোলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম—জাভা বালিতে প্রায় বছরখানেক ঘুরে আজ মাস তিনেক হলো বর্মায় এসেছি।

—আপনার ভাগ্য ভালো, আর কিছু বিলম্ব করলে জাভা-বালিতেই আটক পড়ে যেতেন। তা, বর্তমানে কী বর্মা রণাঙ্গনে ওয়ার করস্‌পণ্ডেন্টের মতো টুর করে বেড়াবেন বলে স্থির করেছেন নাকি ?

যুবকটির মুখে এক ধরণের করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই তাহা আবার মিলাইয়া গেল। কোন কথাই সে কহিতে পারিল না।

বর্মী যুবতীটি এতক্ষণ তাহার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। এইবার সে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল ঃ আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে—আমি একটু ঘুরে আসি। আপনি এঁদের সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন।—বলিয়া সে আগাইয়া চলিল।

যুবকটি ধীরে ধীরে মাটির উপর বসিয়া পড়িল চিন্তাগ্রস্তভাবে।

পাঁচ

টোয়েন্‌টি ফিফ্‌থ্‌ স্ট্রীটের উপর একখানা সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী। মলয় নিজের কামরাটিতে ইজিচেয়ারে বসিয়া উদাস মনে সিগারেট ফুঁকিতেছিল।

বাল্যকাল হইতেই মলয় অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং শিল্পানুরাগী। অতি শৈশবেই মাতৃস্নেহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তিন বছর আগে পিতার মৃত্যু হইলে স্নেহের শেষ বন্ধনটুকুও তাহার ছিন্ন হইয়া যায়। সেই হইতে কেমন যেন নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার পর্বটা কোন প্রকারে শেষ করিয়াই সে তাহার মুক্তপক্ষ মেলিয়া দিয়াছে। অর্থের তাহার অভাব ছিল না—উত্তরাধিকার সূত্রে সে এক বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইল সে। দাক্ষিণাত্য, মাদ্রাজ, মণিপুর ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া সঙ্গীত এবং নৃত্যের পাঠ লইবার পর সে একদিন নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই জাভা ও বলির উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়িয়া বসিল।

আজ এক বছরের অধিক হইল সে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়াছে। সঙ্গীত এবং নৃত্য শিখিবার অদম্য বাসনা তাহাকে জাভা এবং বলি দ্বীপে আনিয়া ফেলিয়াছিল। সেখানকার গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। জাভা ও বলির সমুদ্রতীরবর্তী পল্লীগুলি এক

একটি স্বর্গ বলিয়া ভুল হইয়াছে তাহার। সেখানকার নরনারী, যুবক-যুবতী, বালকবালিকাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে প্রাণধর্মের বিচিত্র উত্থামলীলা। নীল সাগরের বালুতটে বসিয়া মধুময় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ফেনায়িত উদ্দাম-চঞ্চল ঢেউগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সে শুনিয়াছে ইহাদের আকুল-করা সঙ্গীত। মন্দিরে মন্দিরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সে দেখিয়াছে ইহাদের অপূর্ব নৃত্য।

প্রায় বৎসর খানেক যাযাবরের মতো ঘুরিয়া ফিরিয়া সে ব্রহ্মদেশে আসিয়াছে। রেঙ্গুনে মাসখানেক থাকিবার পর বর্মার চারুশিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য সে মান্দালয়ে আসে। এইখানে আসিবার কিছুদিন পরেই সঙ্গীত-সাধক উথিন টুটের বাড়ীতে মাথিন থিনের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়া যায়।

মলয়ের যাযাবর নিরঙ্কুশ মনটি বোধ হয় এখানে বাঁধাই পড়িয়া গিয়াছিল। জাপানীরা যখন মালয়-মৌলমিনে প্রচণ্ডতম বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছিল,যখন বর্মার রাজধানী ব্যাপক বিমানাক্রমণে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইতেছিল ; আর যখন শত সহস্র ভারতীয় বর্মার ত্রিসীমানার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও থাকিতে চাহিতেছিলনা তখনও মলয় নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই মান্দালয়ে অবস্থান করিতেছিল।

কিন্তু আজ কী জানি কেন স্বদেশের প্রতি এক তীব্র মমতাবোধ তাহার মনটিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। মলয়ের মনে হইল : সে অপরাধী,—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। কী করিয়া সে এতদিন দেশের মায়া কাটাইয়া রহিয়াছে ! বাঙ্‌লার উদাস মাঠ, বাঙ্‌লার ছায়া-সুশীতল পল্লী, বাঙ্‌লার খরস্রোতা নদী—সবই তো তাহাকে আহ্বান করিতেছে। মাতৃভূমির এই আহ্বান সে উপেক্ষা করিবে কী করিয়া ? কিন্তু ?

এই প্রচণ্ড 'কিন্তু'টাই তো যত অনর্থ বাধাইয়া বসিয়াছে। এক মধুর কোমল আকর্ষণ মান্দালয়েই তাহাকে প্রচণ্ড শক্তিতে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে যে!......মলয় দিশাহারা হইয়া উঠিল।

এমন সময় প্যাগোডা-চিত্রিত শুভ্র পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল মাথিন থিন।

অভিমান-ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলিল: বলা নেই, কওয়া নেই কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? আমি রুমে এসে দেখি আপনি নেই,—ভাবলুম স্টাডিতে গেছেন। সেখানে গিয়েও আপনাকে পেলাম না। পরে খোঁজ করে জানলুম, কোথায় নাকি বেরিয়েছেন। বেশ লোক যাহোক —অমন করে ভাবিয়ে তুলতে আছে বুঝি! কোথায় গিয়েছিলেন শুনি?

মলয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল: স্টেশনে।

—স্টেশনে!

—হ্যাঁ; সেই বাঙালী ভদ্রলোকদের 'সি অফ' করতে গিয়েছিলাম।

—ও, তাই বলুন।—মাথিন যেন আশ্বস্ত হইল।

বাহান ঘরে ঢুকিয়া কফির ট্রে রাখিয়া গেল। মাথিন উঠিয়া এক কাপ কফি প্রস্তুত করিয়া মলয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিল।

মলয় শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া মাথিনের মুখের পানে তাকাইল একবার। তারপর নীরবে কফির কাপটি লইতে হাত বাড়াইয়া দিল।

মাথিন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল: জানেন, আজ দুদিন ধরে আপনার 'ব্রোকেন র‍্যাপ্‌ছডি'র কল্পনাটা নিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে নাচের একটা মোটামুটি পরিকল্পনাও ঠিক করে ফেলেছি?

—ওঃ, তা হবে। বলিয়া মলয় পেয়ালায় একটা চুমুক দিল।

মলয়ের অন্যমনস্কতায় মাথিন রীতিমত আহত হইল।

অভিমান-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—আজ আপনি কেমন যেন উদাসীন। আমার এত সাধের নাচটা পর্যন্ত দেখবার কোনো আগ্রহ নেই আপনার!

মলয়ের এতক্ষণে যেন চেতনা হইল: না, না, আমার আগ্রহ নেই কে বললে! নিশ্চয়ই দেখবো আপনার নাচ।—বলিয়া সে একবার হাসিবার চেষ্টা করিল। —কই, আপনি তো কফি নিলেন না!

মরাল গ্রীবাখানি একটু বাঁকাইয়া মাথিন অভিমানের সুরেই বলিল—যা'হোক, এতক্ষণে তবু খেয়াল হল!

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিল মলয়: তার জন্য ক্ষমা করবেন। এখন বলছি, এক কাপ কফি নিন। কফি খাওয়ার পর আপনার নাচ দেখবো।

হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল মাথিনের অধর কোণে। এক কাপ কফি প্রস্তুত করিয়া কয়েক চুমুকেই কাপটি নিঃশেষ করিয়া ফেলিল সে। তারপর কী যেন ভাবিয়া ব্যস্ততাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল: আমি এক্ষুণি আসছি, আপনি ততক্ষণে কফিটা খেয়ে নিন।—বলিয়া সে চঞ্চল হরিণীর মতোই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাড়াতাড়িতে তাহার কবরী হইতে ফুলের মালাটি খসিয়া পড়িল।

উদ্বেলিত বুকে মলয় ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া কুড়াইয়া লইল মালাটি।

মাথিন পুনরায় ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে দেখিয়া মলয় মুগ্ধ-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যে-রঙীন বসনাদিতে তাহার পুষ্পিত দেহতনু আবরিত ছিল এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। তাহার পরিবর্তে শুভ্র সিল্কের বিচিত্র বেশভূষায় সাজিয়া আসিয়াছে সে। শুভ্র বসনা মাথিনকে তুষার দেশের রাজকন্যার মতোই মনে হইল। তাহার কবরীতে একগুচ্ছ শুভ্রফুল। কণ্ঠে শুভ্র ফুলের একগাছি মালা

নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত-চন্দনে ললাটখানি চিত্রিত। ডান হাতে একটি শ্বেত পদ্ম।

মলয়ের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল মাথিন : মালী একরাশ ফুল দিয়ে গেছে, ভারী মিষ্টি গন্ধ, আপনার জন্যে একটি পদ্ম এনেছি, এই নিন।

ফুলটি লইয়া মলয় একবার তাহার ঘ্রাণ লইল। তারপর চোখ তুলিয়া চাহিল মাথিনের মুখের পানে—খোঁপার মালাটা আপনি যাওয়ার সময় পড়ে গিয়েছিল ; এই যে।

—থাকনা ওটাও আপনারই কাছে।

মলয়ের কী মনে হইল কে জানে,—মুহূর্তখানেক নীরব থাকিয়া আবার মুখ তুলিতেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল—মাথিনের স্বপ্নময় অধর দুটিতে ফুটিয়া উঠিল সলজ্জ হাসির স্তিমিত রেখা। তাহার স্নিগ্ধ আঁখি দুটিতে উছলিয়া উঠিল সাত সমুদ্রের নীলিমা-মায়া। আবেশ জড়িত কণ্ঠে সে বলিল : এবার পিয়ানোটা নিয়ে একটু বসবেন আসুন। আপনার নাচটা বড় করুণ, তাই কাপড় বদলে এসেছি। রঙিন কাপড়ে এ নাচ মানায় না।

মলয় ধীরে ধীরে উঠিয়া পিয়ানোটির পাশে গিয়া বসিল।

—কোন্ সুরটি বাজাবেন বলুন তো?—মাথিন ঘুঙুর বাঁধিতে বাঁধিতে প্রশ্ন করিল।

—আপনিই বলুন।

—সেই সুরটি, সেদিন যে ভায়োলিনে বাজাচ্ছিলেন!

মলয় সোৎসাহে পিয়ানোটি বাজাইতে লাগিয়া গেল। আর মাথিন সেই সঙ্গে তাহার কমণীয় দেহের লীলায়িত ভঙ্গিমায় ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল ব্যর্থ প্রেমের তীব্র বেদনাময় আবেগের ফেনিল উচ্ছ্বাস।

মাথিন নাচিয়া চলিয়াছে। মুগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া মলয় দেখিতেছে মাথিনের নৃত্য। তাহার স্ফুটনোন্মুখ প্রেম যেন কোন্ এক মায়া স্পর্শে সজাগ এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহার সকল ভাবনা, সকল চিন্তা মুহূর্তে দূর করিয়া নিজের দুর্বার বেগ তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চাহিল। কিন্তু কোন্ এক মুহূর্তে চকিতে তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল সম্মুখের ড্রেসিং টেবিলটার উপরে রাখা তাহার বাবার ফটোখানার উপর—আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাগার মনে পড়িল বাড়ীর কথা,—মনে পড়িল তাহার সখের বাগানটি,—বিধবা পিসিমাকে স্মরণ হইল,—বন্ধু অজিত, স্নেহময় নায়েব মশায়, দারওয়ান রামপ্রসাদ, ভৃত্য মনুয়া, কুকুর ব্ল্যাকি—সকলেরই কথা ছায়া-ছবির মতো তাহার মনের পর্দায় পর পর জাগিয়া উঠিল! সে যেন শুনিতে পাইল তাহাদের কাতর আহ্বান।...আবার অন্তরে তাহার জাগিয়া উঠিল দুই প্রতিকুল শক্তির মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের বেদনা-বোধ। পিয়ানোর সুর ধীরে ধীরে থামিয়া গেল।

মাথিনের বিস্ময়ের অবধি রহিলনা। তাহার চরণের মঞ্জীর-ধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল নিমেষে। মলয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল সে। তখনও ফটোখানার উপর মলয়ের নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে,—ছল ছল করিতেছে তাহার চোখ দুটি।

—আপনার কী হয়েছে? কোন অসুখ করেনি তো?—উৎকণ্ঠ ভাবে মাথিন মলয়ের কপালে হাত রাখিল।

মাথিনের করস্পর্শে মলয়ের চেতনা ফিরিল যেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে জড়িত কণ্ঠে বলিল: অসুখ? না তো।

—ছল ছল করছে চোখ দু'টো; নিশ্চয়ই মাথা ধরেছে আপনার—বলিয়া মাথিন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর ফিরিতেও বিলম্ব হইল না। এ্যাস্পিরিন্ ট্যাবলেটের শিশি ও এক গ্লাস জল আনিয়া মলয়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিন্—মাথা ধরা সেরে যাবে।

মলয়ের মাথাটা সত্যিই ধরিয়াছিল হয়তো। সে নীরবে ট্যাবলেট দুটি খাইয়া ফেলিল।

মাথিন বলিল ঃ এবার একটু শুয়ে পড়ুন তো,—ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘুম যে তাহার আসিবে না তাহা মলয় ভাল ভাবেই জানিত; তবু কী যেন ভাবিয়া সে উঠিয়া গিয়া বিছানাটিতে শুইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন গভীর। মাথিন পালঙ্কের উপর বিনিদ্র চোখ মেলিয়া শুইয়া আছে। সেড-যুক্ত নীল আলোর স্তিমিত আভা ঘনাইয়া তুলিয়াছে তাহার চোখের সজল নীলিমা। পলকহীন তারা দুটি ঘরের কোনে পেডাস্টেলের উপরস্থিত আইভরির বুদ্ধ মূর্তিটার উপর নিবদ্ধ। তাহার আশঙ্কা-দুর্বল নারী-হৃদয়ে তখন বিষাদের কালো মেঘের মাতামাতি। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ভীরু বুকখানি কাঁপিয়া উঠিতেছে। মলয়ের অস্বাভাবিক পরিবর্তনে সে ব্যাকুল। আজ যতবার সে মলয়ের ঘরে গিয়াছে ততবারই তাহাকে উদাসীন দেখিয়া নীরবে ফিরিয়া আসিয়াছে। মাথিন ভাবিয়া যেন কূল পাইতেছিল না।

কোথা হইতে তখন ভায়োলিনের রেশ ভাসিয়া আসিল—সেই জাভানিজ সুর। মাথিন চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। ওভারকোটটা টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বাহির হইয়া গেল সে।

সুপ্রশস্ত বারান্দার শেষপ্রান্তে যেখানে ফুলের টবগুলি দিয়া ঘেরা কয়েকটি বসিবার চেয়ার তাহারই একটিতে বসিয়া উদাস মনে মলয় ভায়োলিন বাজাইয়া চলিয়াছে। নিঃশব্দে মাথিন তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

মলয় সেদিকে লক্ষ্য করিল কি করিল না; ভায়োলিনখানি তেমনি কাঁদিয়াই চলিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে একটা করুন মীড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ধীরে ধীরে থামিয়া গেল ছড়ের শেষ টানটি।

মলয় প্রশান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল,—এখনও ঘুমোন নি?

—না।—আবেগে মাথিনের হৃদয় মুহূর্তের জন্য একবার দুলিয়া উঠিল: আপনিও ঠাণ্ডায় আর বসে থাকবেন না দয়া করে।

—বাইরে বসে থাকতে আজ কেন জানি বেশ ভাল লাগছে। এ ঠাণ্ডায় কিছু হবেনা আমার।—বাহিরের আকাশের দিকে উদাসীন চোখ মেলিয়া জবাব দিল মলয়।

মাথিন নীরব। ফুলের সুগন্ধে স্থানটি আমোদিত। শীতের গাঢ় কুহেলিতে আকাশ আচ্ছন্ন। মলয় ধীর-কণ্ঠে ডাকিল—মিস্ থিন!

—কী বলছেন?

—আমায় এবার বিদায় দিতে হবে যে।

—বিদায়!—বিস্ময়-বিহ্বল মাথিনের কণ্ঠ।

—দেশে ফিরতে হবে না? অনেকদিন হলো বেরিয়েছি।

—কিন্তু,—মাথিনের কণ্ঠ অশ্রুজড়িত হইয়া উঠিল।

—দয়া করে বাধা দেবেন না মিস্ থিন।

মাথিনের মুখ দিয়া কোনো কথা সরিল না।

উদাস কণ্ঠে মলয় কহিল—আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

মাথিন মুহূর্তে অধীর হইয়া উঠিল : কিন্তু এখনই আপনি যেতে চাইছেন কেন ? আমাদের দেশের গান-বাজনা, আমাদের দেশের নাচ এখনো তো সম্পূর্ণভাবে আপনার শেখা হয়ে ওঠেনি।

—ভবিষ্যতে আর একবার এসে শিখে নেওয়ার বাসনা রইল মিস্ থিন।

হঠাৎ মাথিনের বুকখানা তোলপাড় করিয়া নারী-হৃদয়ের সমস্ত আবেগ যেন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল : না, না, আপনি যেতে পারবেন না কিছুতেই যেতে দেবোনা আমি।

মলয় কোন কথা বলিতে পারিল না। শুধু মৌন-বিস্ময়ে সে মুখ তুলিয়া তাকাইল মাথিনের 'পানে,—তাহার গণ্ড বাহিয়া তখন অঝোরে ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অন্ধকার-ম্লান আকাশের তারার ক্ষীন আলোয় মলয়ের তাহা চোখে পড়িল কিনা কে জানে।

কোথা হইতে শীতার্ত রজনীর বুক চিরিয়া এক ঝলক হিমেল বাতাস বহিয়া গেল। আর তাহারই স্পর্শে পুলকের স্পন্দন পড়িয়া গেল চীনা মাটির টবগুলির কার্নেশন পুষ্পগুচ্ছে—চকিত-শিহরে স্ফুটনোন্মুখ কলিগুলি অলক্ষ্যে একটি করিয়া পাপড়িও মেলিতে সুরু করিয়া দিল।

পরদিন সকালে।—

চায়ের ট্রে হাতে মাথিন নিঃশব্দে মলয়ের ঘরে ঢুকিল। একটা কাউচে পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল মলয়। নিতান্তই ক্লান্ত বোধ হইতেছিল তাহাকে। অন্যমনস্কভাবে সে সিগারেট টানিতেছিল।

মাথিন একটা ছোট টেবিলের উপর ট্রেখানা রাখিয়া নীরব নত-

মুখে রুটিতে মাখন মাখাইতে লাগিয়া গেল। আর মুখ ফিরাইয়া নিষ্পলক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল মলয়।—মাথিনের নীল চোখ দুটির চারিপাশে কালিমা, নিতান্ত অযত্নে-বাঁধা শিথিল কবরী তাহার পুষ্পহীন; সারা মুখখানিতে উৎকণ্ঠার ছায়াপাত—অধর দুটি ম্লান, এক গোছা চুল কানের উপর দিয়া তাহার বিবর্ণ কপোলে আসিয়া পড়িয়াছে।

মলয়ের অন্তর চকিত বেদনায় হঠাৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল ঃ মিস থিন!

পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে মাথিন আনত মুখেই উত্তর দিল ঃ বলুন।

মলয় কী যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল,—বলা হইল না।

মাথিন মৃদু কণ্ঠে বলিল ঃ আসুন, চা হয়েছে।

মলয় উঠিয়া টেবিলটার পাশে আসিয়া বসিল।

মাথিন তাহার সম্মুখে চায়ের কাপ রাখিতে রাখিতে বলিল ঃ কী বল্‌তে চাইছিলেন, বল্‌লেন না তো?

মলয় এক টুকরা মাখন-রুটি মুখে ফেলিয়া বলিল ঃ না, এমন কিছু নয়।—বলিয়া সে চায়ের কাপে পর পর কয়েকটা চুমুক দিল।

এমন সময় পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল বাহান ঃ মিসি-বাবারা এসেছেন।

মাথিন চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত কয়েক পরে বর্মী আধুনিকার ছোট একটি দল কলরব করিতে করিতে মাথিনের সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া সমস্বরে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বসিল মলয়কে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া একটা একান্ত বাঙ্গালী-সুলভ নমস্কারের ভঙ্গি করিল মলয়।

চটুল ভঙ্গিতে মাইমি আগাইয়া আসিল : বিশেষ করে আজ আমাদের আপনার কাছেই আসা।

—আমার কাছে! কেন বলুন তো?

—পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে।

মলয় শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল : যুদ্ধের আবহাওয়াটা যখন দিন দিন মন্দের দিকে চলেছে তখন এ-ধরণের উৎসব-আমোদ কী বন্ধ রাখা সঙ্গত নয়?

তানচির অধর কোণে বাঁকা হাসির বিদ্যুত খেলিয়া গেল : শেষ কালে যুদ্ধ নিয়ে আপনিও ভাবতে সুরু করে দিয়েছেন দেখছি!

এইবার রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিল মলয় : কী যে বলেন আপনারা? যখন সারা বর্মা জুড়ে হাহাকার জেগেছে তখনও কী যুদ্ধের কথা ভাববোনা? মালয়ের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল—আজ কালই হয়তো সিঙ্গাপুরের পতন হবে—বাঙ্‌লার সহরগুলির ওপর জাপানী বিমান হানারও হয়তো আর দেরী নেই—এখনও যদি যুদ্ধের কথা না ভাবি তবে আর ভাববো কখন বলতে পারেন? শিল্পী হলেই যে নির্লিপ্ত আর উদাসীন হতে হবে এমন কথাটাই বা আপনাদের কে বল্‌লে?

কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতেই মলয় হয়তো তাহার উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতনই হইয়া পড়িয়াছিল। কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক করিয়া সে পুনরায় বলিল : মাপ করবেন; একটু 'মুডি' হয়ে পড়েছিলাম। তা'—কিসের পার্টি বলুন তো?

আশঙ্কা-ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া মাথিন মলয়ের দিকে চাহিয়া রইল।

মালা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল : মাইমির বার্থডে পার্টি।

বার্থডে পার্টি!—মুহূর্ত্তে কোথা হইতে কী হইয়া গেল! কিসের একটা

তীব্র কশাঘাতে মলয়ের যেন চমক লাগিল। তাহার মুখ দিয়া নিজের অজ্ঞাতেই বাহির হইল অস্ফুট একটি কথা: বাবার মৃত্যু-বাৎসরিকী! নিমেষের মধ্যেই তাহার বুকখানা তোলপাড় করিয়া জাগিয়া উঠিল উচ্ছ্বল বেদনার ফেনিল গর্জন। ধীরে ধীরে সে উন্মুক্ত জানালাটার পাশে গিয়া বাহিরের পানে দৃষ্টি মেলিয়া দিল: বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি তো এক বৎসর হইল বন্ধ! সে এমনই পুত্র যে তাঁহার শ্রদ্ধানুষ্ঠানের কথা ভুলিয়া রহিয়াছে—এমনই দায়িত্বজ্ঞানহীন সে—এমনই তাহার নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা! না—না, সে আর এক মুহূর্ত বর্মায় থাকিবে না। তাহাকে ফিরিতেই হইবে। কোন বন্ধনই সে স্বীকার করিবে না। সে বিদায় লইয়া যাইবে—আজই চলিয়া যাইবে। কিন্তু, মাথিন! মাথিন তো সম্মুখে আসিয়া বাহু মেলিয়া দাঁড়াইবে—তাহার কাতর সজল চোখের দিকে চাহিলে সে নিশ্চিত পাষাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু যাইতে হইবে তাহাকে। না গিয়া যে উপায় নাই। রাত্রির অন্ধকারে মাথিনের অজ্ঞাতেই সে বিদায় লইবে। ট্রেন নাই বা পাওয়া গেল তখন। মোটরেই সে পিনমনা যাইবে। সেখান হইতে প্রোম। তারপর? তারপর শত সহস্র পলাতকের মতোই সে-ও নীরবে তাহার দুঃখের যাত্রা সুরু করিয়া দিবে।...মলয়ের মুখখানিতে এক ধরণের প্রশান্তি নামিয়া আসিল।

মলয় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আধুনিকার দলটি ইতিমধ্যে চলিয়া গেছে; মাথিনের নির্দেশেই। চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া অসহায় কাতর দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে মাথিন থিন।

কী যেন ভাবিয়া মলয় স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: ওঁরা বুঝি চলে গেছেন?

মাথিন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল: হ্যাঁ।

—ওঁদের সঙ্গে নিতান্ত অভদ্র ব্যবহারই করে ফেলেছি আজ। বড্ড

লজ্জা হচ্ছে। অপরাধীর মতো হাত দুটি কচলাইতে সুরু করিল মলয়ঃ বলতে পারেন ওঁদের পার্টিটা কখন ?

— আজ পাঁচটায়।—মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল মাথিন।

—আমি যাব। না গেলে তাঁরা আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেন না।

রীতিমত বিস্ময় বোধ করিল ম্যাথিন। ধাঁধার মতো মনে হইল মলয়ের ব্যবহার ঃ আপনি যাবেন !

—না গেলে কী সেটা ভাল দেখাবে ?—বলিয়া মলয় কিছু একটা ভাবিয়া লইলঃ হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি আজ দুপুরের দিকে একবার মার্কেটিং-এ বেরুব। যা হোক একটা প্রেজেণ্ট দিতে হবে তো। আচ্ছা, কী দেওয়া যায় বলুন তো ?

এতক্ষণে যেন মেঘ কাটিয়া গেল। আনন্দের লালিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল মাথিনের মুখখানি। হাসিমুখে সে কহিল,—আপনিই বলুন না ?

—এই ধরুন নীল পাড়ওয়ালা সাদা শিল্কের একখানা শাড়ী ?

—শাড়ী ! মাথিনের নীল চোখের তারা দুটি অধীর পুলকে নাচিয়া উঠিল ঃ শাড়ী ! বাহ, চমৎকার হবে। আমিও যাব দোকানে, পছন্দ করে দেব।

—উঁহু, ওটি হচ্ছে না। দুপুরের রোদে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হবে না আপনাকে। তার ওপর বাজার রোডে যা ভিড়। আমি তিনটে নাগাদ বেরুবো। শাড়ীটা কিনে বাড়ী ফিরেই আপনাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়বো। আপনি কিন্তু তৈরী হয়ে থাকবেন।

—বেশ তাই হবে। ড্রাইভারকে আমি বলে দিচ্ছি। বলিয়া মাথিন পর্দা উড়াইয়া চলিয়া গেল এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতো।

বেলা তিনটার দিকে মলয় বাহির হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, শাড়ী কিনিবার উদ্দেশ্যটা নিতান্তই গৌণ। যে-কোন উপায়ে আজই তাহাকে একখানা মোটর ঠিক করিয়া ফিরিতে হইবে।

পার্টি হইতে ফিরিতে তাহাদের বেশ খানিকটা রাত্রিই হইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মলয় বলিল,—হৈ চৈ করে নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আপনি। আজ আর বেশী রাত জাগবেন না।

মাথিন সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল,—আপনিই তো ঘুমোতে দিচ্ছেন না।

—এবার থেকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন।—কথাটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মলয়ের মুখখানা মুহূর্তের জন্য কেন জানি কালো হইয়া উঠিল। মাথিন তাহা লক্ষ্য করিল না।

ঘরে ঢুকিয়া সোফায় সটান এলাইয়া পড়িল মাথিন। মলয় গায়ের শালখানা আলনায় ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল: আজ আপনাকে কার মতো দেখাচ্ছিল জানেন?

সুন্দর ভঙ্গিতে গ্রীবাখানি হেলাইয়া মাথিন কহিল: কার মতো শুনি?

পালঙ্কের উপর আসিয়া বসিল মলয়। তারপর একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া কহিল,—'স্নো হোয়াইট'এর মতো।

তরল হাসির জল-তরঙ্গ খেলিয়া গেল মাথিনের কণ্ঠে: কী যে বলেন আপনি!

—বিশ্বাস না হয়, দাঁড়ান না গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে?

মাথিনের সারা মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত

নীরব থাকিয়া সে বলিল : জানেন, মাইমি আজ কী বলছিল আপনার শাড়ীটা পেয়ে ?

—কী ?

—সে নাকি আপনার প্রেমেই পড়ে গিয়েছে !

—বলেন কী, এত বড় সুসংবাদ ! আপনাকে তো মিষ্টিমুখ করাতে হয়। দেখা যাচ্ছে, আমার মতো লক্ষ্মীছাড়া মানুষকেও তাহলে মেয়েরা ভালবাসতে পারে।—মলয় হাসিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু মাথিন সে হাসিতে যোগ দিল না। তাহার নীলাঞ্জন চোখ দুটি কিসের ছায়া পড়িয়া ম্লান হইয়া রহিল। নত মস্তকে হাতের পান্নার আংটিটা খুঁটিতে খুঁটিতে সে বলিল,—নিজের মূল্য এত কম বলে মনে করেন কেন ?

—মূল্য ! আমার আবার কী মূল্য থাকতে পারে ?

মাথিনের ম্লান চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল। একগুচ্ছ চুল উড়িয়া আসিয়া তাহার কপালে পড়িয়াছিল। সেগুলিকে সরাইয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল সে। তারপর রুদ্ধস্বরে কহিল : জানেন, পৃথিবীতে একদল লোক আছে, তাদের মূল্য নেই বলেই তারা এত সহজেই সব জায়গাতে জিতে যায় ? দুর্বলতার চাইতে বড় অস্ত্র আর কিছুই নেই,—সে কথা আপনি জানেন ?

মাথিনের কণ্ঠে যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে মলয়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বলিল,—আপনি কী বলছেন মিস্ থিন্ ?

—কী বলছি ?—সেতারের ঝঙ্কারটা অকস্মাৎ থামিয়া গেলে, সোনালি তারগুলির মধ্যে যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার বেদনার্ত রেশটুকু কাঁপিতে থাকে, মাথিনের স্বরেও তেমনি মৃদু স্পন্দন বাজিতে লাগিল : জানবেন, শুধু জয় করতে পারাই চূড়ান্ত নয়, নিজের দিক থেকেও

একটা কর্তব্য আছে। আর তা যদি না হয়, আপনি ব্যাধ মাত্র,—কেবল হত্যাতেই আপনি আনন্দ পান।

বলিতে বলিতে বর্মী মেয়েটি কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; তারপরেই সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু একটা বলিবার আগেই মলয় দেখিল, শ্বেত কপোতের মতো তাহার লঘু ক্ষিপ্র দেহটি দ্রুত-চরণে কখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

রাত্রি তখন তিনটা।

মলয় টেবিলটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্র হাতে একখানা চিঠি লিখিতেছিল। লেখা শেষ করিয়া চিঠিখানা সে খামে পুরিয়া লইল এবং শিরোনামায় মাথিনের নাম লিখিয়া টেবিলের উপর সেখানা রাখিয়া দিল। তারপর ব্যথিত মুখে উঠিয়া একহাতে স্যুটকেশ এবং অন্য হাতে ভায়োলিন কেস আর বেডিংটি তুলিয়া লইতেই দেয়ালের পাশে-রাখা চন্দন কাঠের বুদ্ধ মূর্তিটার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিদ্যুৎ চমকের মতো কী যেন মনে পড়িল তাহার। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের দুয়ার ঠেলিয়া নিঃশব্দে নিচে নামিয়া গেল।

ফটকটির অনতিদূরে একখানা মোটর যখন মলয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তখন মাথিন থিন তাহার দুগ্ধ-ফেনিল শয্যায় ঘুম-ঘোরে হয়তো বা মিলনের স্বপ্ন রচিয়াই চলিয়াছে।

ছয়

প্রোমের দক্ষিণ প্রান্তে ইরাবতীর তীরে কয়েক মাইল জুড়িয়া পলাতকের বিরাট ক্যাম্প। রেঙ্গুন-প্রোম রোড এবং ইরাবতীর পূর্ব তীর,—এই দু'য়ের মাঝামাঝি যে-বন্ধুর জমি পড়িয়া আছে, তাহারই এক অংশ বাছিয়া লইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ বাঁশের শত শত ছোট বড় ঘর প্রস্তুত করে। ঘর? যখন বেড়ার ফাঁক দিয়া শীতের হিমেল বাতাস শাসাইতে শাসাইতে হাঁকিয়া আসে, ছাউনির ফাঁকে ফাঁকে যখন নির্মেঘ আকাশের তারার মালা চিক চিক করিয়া ওঠে, শিশির যখন ভিতরের সব কিছুই সিক্ত করিয়া তোলে তখন ইহাদের ঘর না বলিয়া আর সব কিছুই বলা যাইতে পারে। কিন্তু তবু এইগুলি ঘর। ঘরই যদি না হইবে তবে শত সহস্র পলাতকের দল ইহার মধ্যে নির্বিকারে মাথা গুঁজিয়াই বা থাকে কী করিয়া?

যে-সব ছোট ছোট টিলাগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অদূরবর্তী পর্বতমালার সম্মুখে নির্লজ্জের মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপরে, গায়ে এবং পাদদেশে এইসব ঘর। এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কর্ষণের অনুপযোগী সমতল ভূমি অনাদরে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সব স্থানেও অগণিত ঘর উঠিয়াছে আজ।

বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয়েরা এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু অগণিত ফৌরঙ্গী এবং বাঙালীদের জন-সমুদ্র হইতে চুনিয়া চুনিয়া তাহাদের

পৃথক ভাবে বাহির করা কঠিন। বিভিন্ন দেশীয়দের বহু বিচিত্র ভাষা,—দূর হইতে কান পাতিয়া শুনিলে মনে হয় কোলাহলপূর্ণ ক্যাম্পটি যেন হাঁউ মাঁউ করিতেছে।

এই সমগ্র ক্যাম্পটিতে জল সরবরাহ করিতেছে স্বয়ং প্রকৃতি। যাহাদের জলের প্রয়োজন তাহারা নিজেরাই গিয়া কেরোসিনের শূন্য টিন কিম্বা ওই ধরণের পাত্র ভরিয়া ইরাবতী হইতে জল লইয়া আসে। সাবধানীর দল জল ফুটাইয়া পান করে। অশিক্ষিত, মূঢ় কিম্বা অসাবধান যাহারা, কাঁচা জলই তাহারা তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পান করিয়া অনাগত মহামারীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চলে।

শত সহস্র পলাতকের মধ্যে শতকরা আশি জনই সর্বহারা নিঃস্ব। কোরঙ্গী কুলি-মজুর, চট্টগ্রামবাসী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নোয়াখালির সাম্পান-চালক এবং বিহারী জেলেদের অনেকেরই পরিধানের বস্ত্রগুলি ব্যতীত আর কোন কিছুই তাহাদের সঙ্গে নাই। ২৩শে এবং ২৫শের বোমাবর্ষণের সময় ইহাদের অনেকেই যে যেখানে ছিল সেখান হইতে সেই যে তাহারা প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া সহরের বাহিরে আসে আর ফিরিয়া যাইবার ভরসা পায় নাই। অপেক্ষাকৃত চতুরের দল বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া অল্-ক্লিয়ারের পরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সহরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ ঘর হইতে হাতড়াইয়া যে যাহা পায় তাহা লইয়াই আবার সরিয়া পড়ে এবং নিজেদের একান্তই সৌভাগ্যবান মনে করিয়া হয়তো ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মপ্রসাদ বোধ করে।

এই নিঃস্ব সর্বহারার দল ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রচণ্ড শীতের রাত্রি একরকম বসিয়া বসিয়াই কাটাইয়া দেয়। তাহাদের সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড শীত-জর্জর অস্থির কম্পন থামাইতে পারে কই? আর আহার বলিতে যাহা কিছু বোঝায়, তাহা তো অনেকেরই অদৃষ্টে

জোটে না। পরমুখাপেক্ষী হইয়া ইহারা ভাতের ফ্যান কিম্বা কাহারো উচ্ছিষ্টের জন্য ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। তাহাও যখন জোটেনা, তখন আঁজলা ভরিয়া স্নেহশীলা নদীর জল খাইয়াই দিনের পর দিন কাটাইয়া দেয়।

আর দিন দিন পলাতকের সংখ্যা শুধু বাড়িয়াই চলে। সরকারের ছাড়পত্র ব্যতীত কাহারো ইরাবতী পাড়ি দিয়া টাঙ্গুপের পথ ধরিবার উপায় নাই। নদীর সাম্পানগুলি পশ্চিম পারেই যেন চিরদিনের মতো নোঙর করা। জরিমানার ভয়ে পূব পারে এক মুহূর্তের জন্যেও সাম্পান ভিড়াইতে সাহস করে না কেউ। বাহির হইবার সদর গেটের নিচে, ইরাবতীর ঘাটে কয়েকখানি সরকারী সাম্পান-নৌকা। ছাড়পত্র পাওয়া লোকেদের ওই পারে নামাইয়া আসে।

প্রোম-টাঙ্গুপের জলহীন দীর্ঘ পার্বত্য-পথে পলাতকের অস্বাভাবিক ভিড় হইলে লোকক্ষয় হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই কিনা কী জানি, কর্তৃপক্ষ দৈনিক পাঁচ শ করিয়া লোক ছাড়ে; কিন্তু পাঁচ হাজার আসিয়া হাজির হয় সেই স্থলে। বাধা-পাওয়া বন্যার জলের মতোই ফাঁপিয়া ওঠে জন-সংখ্যা। বিপুল বিক্ষোভ ও চরম উত্তেজনা দেখা দেয় সারা ক্যাম্প জুড়িয়া।

এবং এই বিক্ষোভই একদিন প্রচণ্ডতম হইয়া ওঠে শত সহস্র বাঙালীদের মনে। যাহাও-বা পাঁচ শ লোক ছাড়পত্র পাইতেছে, তাহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। একি অবিচার!

অবিচার ইহা সত্যই। প্রোমের কে একজন ধনী মাড়োয়ারী তাহার সঞ্চিত যথের ধন হইতে কী ভাবিয়া যেন ক্যাম্প প্রস্তুতির সময় সরকার বাহাদুরকে কয়েক হাজার টাকা নজরানা দিয়া বসিয়াছিল। ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে এই দানবীরের কর্তৃত্বটাই যে ছাপাইয়া উঠিবে তাহা

আর আশ্চর্য কী? এবং নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর দল বঞ্চিত হইয়া চলে।

—দেখছো সিরাজ, কী অবিচার! এ তিন দিনের মধ্যেই আমি সব বুঝে নিয়েছি, কিন্তু এ-অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। এর একটা বিহিত আমায় করতেই হবে।—রন্ধনরত সিরাজের সম্মুখে প্রভাত যেন গর্জিয়া উঠিল।

সিরাজ মুখ তুলিয়া বলিল: কিন্তু কী করবে, বল?

—কী করবো! রীতিমতো বিদ্রোহ করবো, ইয়ারকি নাকি! প্রভাতের উত্তেজনা চরমে উঠিল।

সেড হইতে বাহির হইয়া আসিলেন সুরেশবাবু, কহিলেন: কিন্তু বিদ্রোহের ফলটা শেষতক কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছো?

—আপনি আমার ব্যক্তিগত বিপদের সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন সুরেশবাবু! কিন্তু আপনি কী বুঝতে পারছেন না, মুখবুজে এই অত্যাচার স্বীকার করে নিলে বাঙালী ইভ্যাকুইজদের কী সর্বনাশটা হবে? পাঁচ শো করে লোক ছাড়ছে দিনে—আজ পর্যন্ত ক'জন বাঙালী ছাড়া হয়েছে জানেন? মাত্র সাত জন! কাল নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখি, এক বেচারা লুঙ্গী ফুলিয়ে পাড়ি জমিয়েছে, মাঝ নদীতে যেতে না যেতেই কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল কে জানে! নোয়াখালির সাম্পানওয়ালা, চাটগেঁয়ে অশিক্ষিত গরীবেরা কী করবে? কে ওদের কথা শুনবে? গেটের চারধারে পাশের আশায় ধর্ণা দিয়ে রয়েছে তারা, আর সেই বেটা মেড়োভূত তাদেরই চোখের সামনে ঠেলে ঠেলে পাঠাচ্ছে যত সব পশ্চিমার দল! আমাদের মত লোকেরাও যদি প্রতিবাদ না জানায়, তবে কে জানাবে সুরেশবাবু?

—কী করবে ভেবেছো ?

প্রভাতের মাথার রুক্ষ চুলগুলি ক্রোধে যেন তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিল : প্রথমে তো ওই বর্বরটাকে সায়েস্তা করবো। তারপরে অন্য কথা।

উত্তেজনা বশে হাতের খুন্তিটা কড়াইটার উপরে একরকম ছুঁড়িয়াই ফেলিল সিরাজ : কথার মতো কথা বলেছ প্রভাত। ওই একটি মাত্র উপায় আছে বাঙালীদের বাঁচাবার !

তারপর ?

তারপর এক বিরাট জনতা যেন গেটের অফিসটার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। জনতার পুরোভাগে বিদ্রোহী দলের নেতা প্রভাত। মুখখানা তাহার রীতিমত হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে।

কাহাকে দেখিয়া যেন হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিছনের জনস্রোতও নিশ্চল হইয়া গেল। বজ্র-কঠোর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে ডাকিল : হেলো ইন্‌স্‌পেক্টার !

বর্মী ক্যাম্প-ইন্‌স্‌পেক্টার হয়তো ক্যাম্প পরিদর্শনের কাজেই বাহির হইয়াছিল। প্রভাতের দিক-প্রকম্পী ডাক শুনিয়া বিস্ময়-মন্থর পায়ে আগাইয়া আসিল : কী চান আপনারা ?

—আপনি কী বুঝতে পারছেন না, আমরা কী চাই ?

—না।

—আমরা জানতে চাই, আজ থেকে অন্তত আড়াইশো করে বাঙালী ছাড়া হবে কিনা ?

—আপনাদের মর্জ্জি মাফিক্ কাজ হবে কে বললে !

—হ্যাঁ, আমাদের মর্জ্জি মাফিক্‌ই কাজ করতে হবে এবার থেকে।

—আপনি কী বলছেন! স্পর্দ্ধা আপনার!

—আমরা স্পষ্টই বলছি, যদি আজ থেকে অন্তত আড়াইশো করে বাঙালী ছাড়া না হয়, তাহলে একটা অঘটন ঘটবে।

—অঘটন ঘটবে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অঘটন ঘটবে—বর্ষার ঘনগর্জ্জিত ব্রহ্মপুত্রের ঝঙ্কার শোনা গেল প্রভাতের কণ্ঠে।

—জানেন আপনাকে এর জন্যে এ্যারেষ্ট করা যায়।

—এ্যারেষ্ট!—বিদ্যুৎ গতিতে পিছনে ফিরিয়া ক্ষুব্ধ জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দাঁড়াইল প্রভাত: আমাকে এ্যারেষ্ট করবার পরে কি মনে করছেন এই জনতার কণ্ঠও চাপা পড়ে যাবে?

পর মুহূর্তে জনতার মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভের কোলাহল জাগিয়া উঠিল। আর সেই কোলাহল ছাপাইয়া আবার প্রভাতের বজ্রগর্জন শোনা গেল: বলুন ছাড়বেন কী না?

ইন্‌স্‌পেক্টার রীতিমত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এইবার। সভয়ে কহিল—আমি চেষ্টা করবো।

—শুধু চেষ্টা করবো বললে আমাদের ফেরাতে পারবেন না। আমাদের কথা দিতে হবে।

—এ-ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ হাত না থাকলে কী করে কথা দেবো?

—তবে এতে কার হাত? কার নির্দেশে ইভ্যাকুইজদের ছাড়া হচ্ছে?

—ডি, সি-র।

—মিথ্যা কথা; মাড়োয়ারীটার ইচ্ছামতই আপনাদের কাজ চলছে। আপনার যখন কোন কর্ত্তৃত্বই নেই তখন সে বেটাকেই ডেকে পাঠান। আমাদের যা বলবার তাকেই বলবো।

—বেশ; তিনি এলে আপনাকে ডেকে পাঠাবো।

—না, না। আমাদের সকলের সামনেই তাকে এসে হলফ করে বলতে হবে, আজ থেকে রোজ আড়াইশো বাঙালী ছাড়া পাবে।

এমন সময় জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: ওই তো ব্যাটা আইতেছে।

অনতিদূরে একটা টিলার নিচ দিয়া জনকয়েক অবাঙালী পলাতকের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একজন মাড়োয়ারীকে আসিতে দেখা গেল। প্রভাত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া ইন্‌স্‌পেক্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: ওকে ডাকুন।

তাহাকে অবশ্য ডাকিতে হইল না। জনতা চোখে পড়িতে সে নিজেই আগাইয়া আসিল: কেয়া হুয়া ইনেস্‌প্যাক্টারজী?

মুখ হইতে কথাটা বাহির হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনতার মধ্যে কয়েকজন বিদ্রূপ-বিকৃত কণ্ঠে শৃগালের ডাক ডাকিয়া উঠিল: হুয়াক্কা-হুয়া। এবং পরক্ষণেই সহস্রকণ্ঠে অট্টহাসির রোল পড়িয়া গেল। মাড়োয়ারীটি থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তে শঙ্কিত হইয়া উঠিল তাহার খুদে খুদে চোখদুটি!

প্রভাত চীৎকার করিয়া ডাকিল: ইধার আইয়ে সরকারজী।

সরকারজী কিন্তু আসিবার নামটি করিল না। পলাইবার জন্যই ইতস্তত করিতেছিল সে। প্রভাতের বজ্র-কণ্ঠ আবার হাঁকিয়া উঠিল: কাঁহা ভাগ্‌তা ম্যান, ভালা চাহো তো আ যাও।

মাড়োয়ারীজী শেষ পর্যন্ত না আসিয়া পারিল না। স্পন্দিত বুকে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল: কুছ্ বোলনা হ্যায় বাবুজী?

—হ্যাঁ, বহৎ কুছ্।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কহিয়ে ভাই।—নিতান্তই আপন হইয়া উঠিতে চাহিল সে।

—হাম জান্‌নে চাহ্‌তা কেয়া আজসে আড্‌ডাইশো বাঙালীকো পাশ মিলে গা ইয়া নেহি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ; কিঁউ নেহি। আজহি আপ পাঁচশো আদামি লে কর আ যাইয়ে, পাশ মিল্‌ যায় গা।

তাহার অভিসন্ধি মুহূর্তের মধ্যেই প্রভাতের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল : তুম চাহ্‌তে হো, আজ মুঝকো ভেজ্‌কর্‌ ফিন্‌ কালহি সে খেয়াল মাফিক আদমি ছোড়নে! তুম সোঁচা কে গ্যাঁয় মেরে লিয়ে ইঁহা আয়া!—কথাগুলি বলিতে বলিতে সে আগাইয়া গেল; মাড়োয়ারীটির মুখের উপর মুখ আনিয়া ক্রোধ-উন্মত্তভাবে প্রভাত গর্জিয়া উঠিল : উল্লুক্‌, পাট্‌ঠে !

আর সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন বিদ্যুৎ বেগে বাহির হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রভাতের বারণ না মানিয়া চরম আক্রোশে রীতিমত ধূনিতেই সুরু করিয়া দিল তাহাকে। কে একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধরাশায়ী মাড়োয়ারীটির গলাবন্ধ কোটের কলার ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়া বসিল : আবার ক্যাম্প মুখা হইছ কি হালার পুত, পরান থাইকবো না, কইয়া দিলাম।

মাতালের মতো টলিতে টলিতে মাড়োয়ারীটি চলিয়া গেল।

তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে প্রভাত ক্যাম্প-ইন্‌স্‌পেক্টারকে লক্ষ্য করিয়া কহিল : আশাকরি এবার থেকে দিনে আড়াইশো বাঙালী ছাড়তে আর আপনাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।—বলিয়া সে যুদ্ধজয়ী বীরের মতোই ঘুরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। জনতা বিভক্ত হইয়া তাহাকে পথ করিয়া দিল। উল্লাসের বিপুল ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিল চারিদিক।

ধীর মন্থর পায়ে আগাইয়া চলিয়াছে প্রভাত, সিরাজ, সুরেশ বাবু ও বিকাশ। প্রভাতের উত্তেজিত চেতনা এখন অনেকটা শান্ত। ঝড়ের শেষে প্রকৃতির মতো তাহার মুখখানা বিস্ময়কর ভাবে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। দূরের ওই শ্যামল পাহাড়টার গায়ে তাহাদের সেড্‌টা চোখে পড়িতেছে। শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্যের আলোয় আদিগন্ত চরাচর যেন পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

—প্রভাত বাবু; ও প্রভাত বা—বু।—পিছন হইতে দূরাগত উচ্চ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।

সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, কে একজন তাহাদের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আর তাহার পিছু পিছু আসিতেছে মালবাহী এক কুলিই হয়তো।

মুহূর্ত কয়েক পরে লোকটিকে চিনিতে পারিয়া সকলেই বিস্ময় বোধ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মলয়ঃ এ ভাবে যে আপনাদের দেখা পেয়ে যাব কল্পনাও করিনি। ভেবেছিলাম, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে চলেই গিয়েছেন। তবু কী ভেবে একটি বাঙালী দলকে জিজ্ঞাসা করলাম। প্রভাত বাবুর নাম করতেই সবাই পথ দেখিয়ে বললেন, ছুটে গেলে নাকি আপনাদের পথেই নাগাল পেয়ে যাব।

—কী আশ্চর্য, আপনিও শেষ পর্যন্ত এসে পড়লেন!—সুরেশ বাবু রসিকতা করিলেন।

ম্লান হাসি হাসিল মলয়ঃ না এসে উপায় কী বলুন?

প্রভাত কহিল,—আসুন, আসুন, আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে সকলেই আগাইয়া চলিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সারা ক্যাম্পের নানা দিক হইতে সান্ধ্য আজানের সুমিষ্ট ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। এখানে সেখানে দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল মুসলমানদের। এখন ক্যাম্পটা যেন কিছুটা শান্ত। চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিতেছে শত শত উনুন আর আগুনের কুণ্ড। সেইগুলি ঘিরিয়া বসিয়া অনেকেই আগুন পোহাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। ইথারে নাচিতেছে আগুনের ফুল্‌কি। মাঝে মাঝে লোকের ইতস্তত নীরব আসা-যাওয়া ;—হয়তো উচ্ছিষ্ট কিম্বা ভাতের মাড়ের সন্ধানেই ঘুরিয়া মরিতেছে তাহারা। ইরাবতীর বুক চিরিয়া একখানা স্টিমার কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলন্ত ফ্যানেলের তরঙ্গায়িত ধোঁয়ার রেখা নির্মেঘ আকাশের পটভূমিকায় সজল মেঘখণ্ডের মতো ভাসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক হইতে শোনা যাইতেছে ভুখা বালক-বালিকা-শিশুর করুণ-ক্রন্দন।

অনুচ্চ ছোট একটা শ্যামল পাহাড়। তাহার গায়ে একটা মাঝারি রকমের সেড্। সেডের বাহিরে উনুন জ্বলিতেছে। বিড়িমুখে কালু সওদাগর রান্নায় ব্যস্ত। ডালে ফোরণ দিবার জন্য পাত্রে তেল ঢালিতেছে। বৃদ্ধ মিয়াজান নমাজের পর উনুনের পাশে বসিয়া আগুনে হাত দুটি সেঁকিয়া লইতেছে। আগুনের রক্তিম আভায় বেগুনী হইয়া উঠিয়াছে তাহার কুঞ্চিত কালো মুখখানা। ফিরদৌস আর রহমৎ কী এক গল্প জুড়িয়া দিয়া সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াইতে ব্যস্ত।

কিছুটা দূরে পরিষ্কার খানিকটা ঢালু যায়গা। উন্মুক্ত আকাশের পানে নয়ন মেলিয়া মলয় ভায়োলিনে একটা করুণ সুর বাজাইয়া চলিয়াছে। সেই জাভানিজ সুর। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সিরাজ, সুরেশবাবু ও বিকাশ।

কিছুক্ষণ বাজিয়া ভায়োলিন থামিয়া গেল।

বিকাশ বিহ্বল কণ্ঠে বলিল : এত মিষ্টি হাত আপনার, আগে যে ভাবতেও পারিনি!

সুরেশবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন : আচ্ছা মশাই, আপনি যুদ্ধে গেলেন না কেন?

—যুদ্ধ! এর সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্কটা কী শুনি?

—সম্পর্ক নেই! জাপানী অসুরগুলো এমন সুর শুনলে চোখ বুজে বিশ্বপ্রেমের গান গাইতে সুরু করতো, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

সিরাজ মুগ্ধস্বরে আবৃত্তি করিয়া কহিল :

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।
সুরের হাওয়া ভুবন ফেলে ছেয়ে,
দখিনা যায় কোন্ সুদূরে ধেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুলতর বেগে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

কিন্তু উদাস মলয়ের কানে এই সব স্তুতিবাক্য প্রবেশ করিতে পারিল না। তখন বোধ হয় তাহার মন একান্তভাবেই বিরহের আবেগময় দুঃসহতায় আকুল,—তাহার চোখের নিশ্চল তারায় তখন শুভ্র-বাসনার প্রেম-বিগ্রহ।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল নীরবে।

সুরেশবাবু একটা চুরুট ধরাইয়া লইলেন। আলগা ভাবে কয়েকটি টান দিয়া বলিলেন,—বুঝেছ সিরাজ, মাড়োয়ারীটাকে উত্তম মধ্যম মেহেরবাণী করার ফলটা বোধ হয় ভালই হবে শেষ পর্যন্ত। এ মুখো ও আর হচ্ছে না, এটা নিশ্চিত।

—সেটা তো আমার আগেই জানা ছিল। আমার দুঃখ, তাকে প্রাণে ছেড়ে দেওয়া হল। ভীমের মতো তার বুকের ওপর বসে রক্ত শুষে খেতে পারলেই যেন আমার গায়ের ঝালটা মিটতো।

বিকাশ প্রশ্ন করিল,—আজ শুনলাম সাড়ে তিনশো বাঙালী ছাড়া হয়েছে, সত্যি নাকি?

সুরেশবাবু একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—এ আর এমন কি! যা একখানা ভয় ইন্‌স্‌পেক্টার ব্যাটা পেয়েছে। আজ ক্যাম্প শুদ্ধ বাঙালী ছেড়ে দিলেও আশ্চর্য ব্যাপার হত না।

সিরাজ একটু অধীর হইয়া উঠিল: প্রভাতটা তো আচ্ছা লোক! এখনো ফিরছে না। কোনো একটা কিছু—

বাধা দিয়া সুরেশবাবু কহিলেন,—পাগল না মাড়োয়ারী! ডি, সি, ওকে ডেকে পাঠিয়ে এ্যারেস্ট করে হাজতে পুরবে! সে ব্যাটা ইংরেজের বাচ্চা; ঘাস তো আর খায় না। বুদ্ধিশুদ্ধি কিঞ্চিৎ তার পকেটে আছে!

বিকাশ সায় দিয়া কহিল: প্রভাত যে রকম 'পপুলার' হয়ে উঠেছে তাতে ওর গায়ে আঁচড়টি পড়লে এই হাজার হাজার বাঙালীর দল ক্ষেপে গিয়ে কী একখানা কাণ্ড বাধাবে ভাবো তো! রীতিমতো একজন 'হিরো' হয়ে দাঁড়িয়েছে ও, কী বলেন মলয়বাবু?

—এঁ্যা!—চটকা ভাঙিল মলয়ের। মুখ ফিরাইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল: কী বললেন?

—ও, একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বোধ হয়,—এই বলছিলাম, প্রভাত বাঙালী ইভ্যাকুইজদের কাছে খুব পপুলার হয়ে উঠেছে।

—তা সত্যি, অদ্ভুত লোক তিনি। ওই তো আসছেন।

ধীর মন্থর পায় প্রভাত আসিয়া দেখা দিল।

সিরাজ জিজ্ঞাসা করিল : ডি, সি, কী বললেন তোমায়?

—অনেক কিছুই বললেন। বেশ লোকটা।

—তাতো হল, কিন্তু অনেক কথাগুলো কী শুনি না!

—বাঙালীদের প্রতি এ অবিচারটা নাকি তাঁর অজ্ঞাতেই হয়েছে। এর জন্য তিনি অবশ্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন, আর বলেছেন এবার থেকে নিজেই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধ নিয়ে অনেক কথা হল। লোকটা খুব নির্ভীক, মতামতও বেশ নিরপেক্ষ! সে যা হোক, তাঁকে মোটামুটি বেশ লাগলো। আসবার সময় বললেন, আমরা যে কোনো দিন পাশ চাইলেই পাব।

—তাই নাকি! এনেছ নাকি পাশ?—

—না, কী করে আর আনি? আমাদের আগেই যারা এসে জমেছে তাদের ডিঙিয়ে যাই কী করে? এ-ধরণের বিশেষ অনুগ্রহ গ্রহণ করার পক্ষপাতী আমি নই। আমাদের 'টার্ন' এলে পাশ 'ইস্যু' করতে বলে এসেছি।

সুরেশবাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন : কী যে তুমি একটা! এমন একটা চান্স পেয়ে নিলে না? এই সব নোঙরা লোকগুলোর মধ্যে কী করে যে তুমি থাকতে চাইছ তা তুমিই জানো বাপু!

—আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি সুরেশবাবু। আমাদের পয়সা কড়ি আছে কিছু;—একমুঠো খেতে পারছি। কিন্তু এই হাজার হাজার

লোকের মধ্যে শতকরা আশি জনেরও বেশী একবেলা খেয়ে একবেলা উপোস করছে। তাদের একদিনের বেশী ক্যাম্পে আটক থাকাটাও অসহ্য। যত শীগ্‌গীর সম্ভব তাদের ঘরে গিয়ে পৌঁছানো দরকার। ওদেরই ডিঙিয়ে যাব আমরা! বরং ওরা সবাই বেরিয়ে গেলেই আমাদের মতো যারা তাদের যাওয়া উচিত।

—ওটা আর কারো না ভাই! টার্ন এলে পাশগুলো যেন পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাটাই কোরো দয়া করে।

—আমার বিশ্বাস, আমাদের আর বেশী দিন টার্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ডি, সি-ও তারই আভাস দিয়েছেন আজ।

—তার মানে?

—মানে, কিছুদিন পর বাধ্য হয়ে হয় দৈনিক পাশের সংখ্যা দশগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে, আর তা না করলে, এ নিয়মই একেবারে তুলে দিতে হবে—যার যখন ইচ্ছে যাবে। দেখছো না, কী ভাবে লোক বেড়ে চলেছে; আর কী ভাবে সবারই মনে অসন্তোস জমে উঠছে। বানের জল বালির বাঁধ বেঁধে আট্‌কে রাখবে ক'দিন?

এমন সময় বৃদ্ধ মিয়াজানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: আসেন আপনারা—খানা তৈয়ার।

তখন রাত্রি বোধ হয় ন'টা। আহারান্তে প্রভাতের দল সেডের ভিতরে আসিয়া জড় হইয়াছে। একদিকে প্রভাত, সিরাজ, বিকাশ এবং সুরেশবাবু ব্রীজ খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মলয় তাহার বিছানায় শুইয়া আছে চিন্তাকুল মুখে। অপর দিকে দলের অন্যান্যরা বিচিত্র চট্টগ্রামী ভাষায় নানা খোস গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ মিয়াজানই শুধু

এই সবের মধ্যে নাই,—ঘরের এক কোণে সে একান্ত তন্ময়চিত্তে নমাজের পর তস্‌বিহ্‌ হস্তে জায়নমাজে বসিয়া খোদা-রসুলের নাম-গুণ জপিতেছে।

কোথা হইতে নোয়াখালি সাম্পান চালকের একটা ছোট দল দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—প্রভাতবাবু আছেন? প্রভাতবাবু?

তাসের উপর হইতে মুখ তুলিল প্রভাত: কে?

—মেহেরবানী করি একবার বাইরে আইবেন নি, সর্বনাশ হইছে!

প্রভাত উঠিয়া আসিল দুয়ারের কাছে: সর্বনাশ! কী ব্যাপার বল তো?

—ওলাওঠা বাবু, ওলাওঠা!

—ওলাওঠা!

—হ, যারে আপনারা কলেরা কন।

—কোন্‌ দিকে দেখা দিয়েছে?

—ওই হে দিকে, আমরা যেদিকে থাকি।—আঙুল দিয়া অঞ্চলটি দেখাইয়া দিল বৃদ্ধ: সাঁঝের মধ্যেই ছ'ছটা কৌরঙ্গী সাফ্‌ হইয়া গেছে বাবুসাব। আমরা যে কী করুম বুঝবার না পাইরা আপনার কাছে আইছি। খোদা জানে আমাদের কপালে কী আছে!

প্রভাত এই আকস্মিক দুঃসংবাদে কতখানি বিচলিত হইয়া পড়িল কে জানে। প্রায় চীৎকার করিয়াই উঠিল সে: বাঃ চমৎকার; যা মনে মনে আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই হতে সুরু করলো!

ইতিমধ্যে প্রায় সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছিল। সিরাজ দুয়ারের কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—এখন উপায়?

—একটি মাত্র উপায় রয়েছে এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করেই সেটার

ব্যবস্থা করতে হবে।—বলিয়াই প্রভাত অধীরভাবে নোয়াখালিবাসী সাম্পান-চালকদের দিকে তাকাইল: তোমাদের মধ্যে কেউ ছু'একজন ভলান্টিয়ার ডেকে আনো তো, শিগ্‌গির যাও।

— কী উপায় রয়েছে বললে না তো?

—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ক্যাম্প-ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার। আজ রাতের মধ্যেই যে-অঞ্চলে কলেরা দেখা দিয়েছে অন্তত সে-অঞ্চলের সুস্থ লোকগুলোকে টীকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর কাল সকালের মধ্যে ক্যাম্পের বাকী সবাইকেই টীকে দিয়ে দিতে হবে। তা যদি না হয় তবে সারা ক্যাম্প উজাড় হয়ে যাবে। চল এক্ষুনি, ওভারকোট নিয়ে নাও, বেরুবো।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একজন ভলান্টিয়ার। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাত ব্যস্তভাবে কহিল; আপনার ওপর একটা ভীষণ জরুরী কাজ দিচ্ছি। এ মুহূর্তেই তা করতে হবে আপনাকে। আপনারা,—ভলান্টিয়াররা মিলে সারা ক্যাম্পে জানিয়ে দিন যে কলেরা দেখা দিয়েছে। প্রত্যেককে বলবেন, যদি তারা বাঁচতে চায় তবে যেন নদীর জল ভাল করে ফুটিয়ে খায়। নিজ নিজ ক্যাম্প ছেড়ে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারা যেন কোথাও না বেরোয়। যে-অঞ্চলে কলেরা লেগেছে সেখানকার সুস্থ লোকগুলোকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেবেন। যান, শিগ্‌গীর যান, এক ঘণ্টার মধ্যে সারা ক্যাম্পে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিন। আপনাদের তৎপরতার ওপরই নির্ভর করছে হাজার হাজার লোকের প্রাণ।

নিয়তি ক্রূর হাসি হাসিতে আরম্ভ করিলে যদি বিনা মেঘেই বজ্রপাত হইতে পারে তবে সামান্য ক্ষুদ্র মানুষের আপ্রাণ চেষ্টাও যে ব্যর্থ

হইয়া যাইবে তাহা আর এমন বিচিত্র কী। প্রভাতের সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হইল—রাত্রে নিরাপত্তা-মূলক টীকার কোন ব্যবস্থাই করা গেলনা। এবং নিতান্ত অনিবার্য নিয়মে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল কলেরা। এদিকে ওদিকে মানুষ মরিতে সুরু করে—কয়েকবার ভেদবমি করিবার পর এক একজনের চোখ ঘোলাটে হইয়া আসে। আক্রান্ত সেডগুলি হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া এদিকে ওদিকে আশ্রয় খুঁজিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অনাক্রান্ত সেডগুলির লোক রুখিয়া দাঁড়ায় তাহাদের। নিরুপায় অসহায়ের দল উন্মুক্ত স্থানগুলিতে আসিয়া জড় হয়—ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া উদার আকাশের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। একটা তুমুল আলোড়নে সারা ক্যাম্পখানি উদ্বেল হইয়া ওঠে যেন। সেডে সেডে অনাক্রান্ত পলাতকের দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে ; আর পরম স্নেহময়ী জননী ওলা-দেবী তাঁহার অদৃশ্য কৃপানেত্র মেলিয়া তাঁহার কৃপার পাত্রদিগকে মুক্তি দিয়া চলেন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে তখন। পূর্বাকাশের হালকা মেঘস্তরে সাত রঙের ম্লান আভাস। কোথা হইতে এক ঝাঁক খেয়ালী যাযাবর বালিহাঁস পশ্চিমাকাশের দিগন্ত ঘেঁসিয়া সোজা চলিয়াছে উড়িয়া। মাঝে মাঝে দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে মরণ-কান্না। ক্যাম্পের নানা দিকে মুসলমানদের কণ্ঠ আজান ধ্বনিয়া তুলিতেছে। আজিকার দিনে ইহার একটা বিশেষ আবেদন আছে যেন। মৃত্যু-বিভীষকাপূর্ণ এমন চরম দুর্দিনে একমাত্র ত্রাণকর্তা পরম বিধাতাকে স্মরণ করিয়া অন্তরে ভরসা সঞ্চয় কর। যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি করুণাময়—আজিকার দিনে একমাত্র তিনিই আমাদের রক্ষা করিবেন—আজানের উদাত্ত সুর বিমূঢ় ভীতি-চঞ্চল পলাতকদের নিকট ইহাই যেন প্রচার করিতেছে।

পাহাড়ের গায়ে ঢালু যায়গাটিতে পশ্চিমমুখী হইয়া পাশাপাশি বসিয়া

আছে প্রভাত আর সিরাজ। প্রায় সারা রাত্রি ধরিয়া গ্রাম সহরে ডাক্তারের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরিয়া কিছুক্ষণ হইল তাহারা ফিরিয়াছে। তীব্র মানসিক ক্লান্তির জড়িমা তাহাদের চোখে-মুখে। অদূরবর্তী কোন্ এক সেড হইতে ভাসিয়া আসিতেছে নারীকণ্ঠের পাষাণ-ফাটা বিলাপ-ধ্বনি। হতভাগিনীর একান্ত কোন আপনার জন চক্ষু উল্টাইয়া ফেলিয়াছে নিশ্চয়। সম্মুখের আঁকাবাঁকা তৃণাকীর্ণ পথ বাহিয়া আসিতেছে পলাতকের একটা দল।

একটি সিগারটে ধরাইয়া লইল প্রভাত ঃ এখন ওদের কী জবাব দেব সিরাজ ?

—চেষ্টার তো ত্রুটি হয়নি ; ওদের সব খুলে বল।

প্রভাত বিচলিত কণ্ঠে বলিল,—আজ রাতে মেডিক্যাল এইডের কোনো ব্যবস্থা হলনা! যেভাবে মানুষ মরতে সুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যেই সারা ক্যাম্প শ্মশান হয়ে যাবে, শকুনের পাল নেমে এসে উদর পূরতে সুরু করবে—খেঁকশিয়াল আর কুকুরের দল আকাশ ফাটিয়ে দেবে চীৎকার করে।

—দেখা যাক হেল্‌থ্‌ অফিস থেকে আজ সকালে কোনো ডাক্তার আসে কিনা। যদি না-ই আসে তবে যে হাজার হাজার লোক উজাড় হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ কি।

দলটি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাত শান্তকণ্ঠে বলিল,—কিছু করতে পারলাম না ভাই। রাতে হেল্‌থ্‌ অফিস বন্ধ। কোনো ডাক্তার যোগাড় করা সম্ভব হলনা। আজ সকালে তাঁদের আসার কথা ; এখন দেখি আসেন কিনা।

একজন আগাইয়া আসিয়া কহিল,—প্রায় শ দুইশ লোক আইজ

রাইতের মধ্যেই কাবার হইয়া গেছে বাবুসাব। যদি আইজও ডাক্তার আইসা ফোঁড় না দেন তা হইলে কী কেউ বাঁচবো নি!

—সে তো বুঝতেই পারছি ভাই। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। অনেক বোঝালাম; কিন্তু কেউ এলোনা। আজ সকালের আগে তাদের জিনিষ-পত্তর জোগাড় করে আসা নাকি সম্ভব নয়। এই টীকা দেবার ব্যবস্থা সরকারের আগেই করা উচিত ছিল,—তা যখন হয়নি তখন কপালের ওপর ভরসা করেই থাকতে হবে। কোন্ দিকে বেশী লোক মরছে?

—খাস কইরা একটা দিক কী কইরা দেখাই বাবু। চাইর দিক থিকাই তো হুলুস্থুল উইঠছে। কৌরঙ্গীরাই নাকি মইরতেছে বেশী।

—তোমরা যতটা পার সাবধানে থাকবে। আমি একটু পরেই অফিসে যাব। দেখি ডাক্তার আসেন কিনা।—প্রভাত উঠিয়া সেডের দিকে আগাইয়া গেল।

ভোর হইতে না হইতেই ছাড়পত্রপ্রার্থী এক বিরাট জনতা অফিসের বাহিরে আসিয়া জমিয়া উঠিল। ক্যাম্পের সকল নিয়ম, সকল নির্দেশ সমস্ত শৃঙ্খলতার উচ্ছেদ সাধন করিয়াই যেন আজ তাহারা টাঙ্গুপের পথ ধরিবে—এই কলেরাক্রান্ত বিভীষিকাময় ক্যাম্পে তাহারা এক মুহূর্তের জন্যেও আর থাকিতে প্রস্তুত নয়। ডিপুটি কমিশনারের নির্দেশে ক্যাম্প ইন্‌স্‌পেক্টার বাহিরে আসিল। বিক্ষুব্ধ জনতার উপর চোখ বুলাইয়া সরল হিন্দিতে বলিল,—যাদের আজ যাবার পালা তারাই শুধু বেরিয়ে এসো।

কিন্তু পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং তীব্র উষ্মায় ফাটিয়া পড়িল জনতার কণ্ঠ। কে একজন সম্মুখ হইতে চীৎকার করিয়া জানাইল,—ওসব

পালাটালা রাখি দাও। এমনিতে ছাইড়্বা কিনা কও ? নইলে আমরাই একটা ব্যবস্থা করবো।

—পালা যাদের, তাদের আগে পার করে দিয়ে তোমাদের কথা ভাববো।—

জনতার মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়া উঠিল—ভীড়ের মধ্য হইতে সোৎসাহে অনেকগুলি লোক হাত তুলিয়া তাহাদেরই যে যাইবার পালা তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠের 'মার মার', 'ধর ধর' শব্দে চারিদিক ফাটিয়া পড়িল—দুই দলের মধ্যে বাধিয়া গেল রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ। ভলাণ্টিয়ারগণ বেগতিক দেখিয়া হুইসেল বাজাইল। গেট হইতে সঙ্গীনযুক্ত রাইফেল হাতে ছুটিয়া আসিল একদল পুলিস।

ক্যাম্প ইন্স্পেক্টার সরোষে হাঁকিয়া উঠিল : তোমরা যদি এই মুহূর্তে গণ্ডগোল না থামাও তবে গুলি চালানো হবে।—বলিয়াই পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশকে কী একটা ইঙ্গিত করিল সে।

'দ্রুম্' শব্দে একটা আওয়াজ হইল—রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু পরক্ষণেই বিক্ষুব্ধ জনতা যেন মন্ত্রবলে শান্ত হইয়া গেল।

আবার ক্যাম্প ইন্স্পেক্টর হাঁক ছাড়িল : যাদের পালা তারা বেরিয়ে এসো, দেখি তোমাদের ওপর কারা হাত চালায়।

বলাই বাহুল্য রাইফেলের মুখে কাহারও হাত উঠিল না। পাঁচ-শ' লোক ছাড়পত্র লইয়া সাম্পানে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইয়া চলিল। আর অবশিষ্ট জনতা নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ হইয়া এক একদিকে চলিয়া গেল।

প্রভাত অফিসে পৌঁছিবার কিছু পূর্বে ডাক্তার আসিয়া গিয়াছিলেন। তবে যে বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুটি মাত্র একজন এ্যাসিস্টেণ্ট সহ আসিয়া

হাজির হইলেন, তাঁহার দ্বারা একদিনে কয়জন লোককেই বা টীকা দেওয়া সম্ভব। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল। ভলান্‌টিয়ারগণের সকল ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শত সহস্র লোক ডাক্তারবাবুকে ঘিরিয়া ধরিল পঙ্গপালের মতো। কাহার আগে কে টীকা লইতে পারে, তাহারই যেন একটা তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল। প্রভাত নানা ভাবে তাহার আবেদন জানাইল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। ক্ষেপিয়াই গেছে যেন মূঢ়ের দল! ডাক্তারবাবু বেচারা কী করিবেন। কিছুক্ষণ টীকা দিবার পর লোকের চাপে প্রাণটা খোয়াইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই বোধ করি তিনি ধীরে ধীরে ব্যাগ গুটাইয়া বিদায় লইলেন।

হতাশ হইয়া প্রভাত অফিস্‌-ঘরে ঢুকিল। কয়েকজন ভলানটিয়ার ডাকাইয়া আনিয়া কহিল,—তোমরা ক্যাম্প ঘুরে জানিয়ে দিয়ে এসো যে ডাক্তারবাবু সেডে সেডে গিয়েই টীকে দেবেন। লোকেরা যদি বাঁচতে চায় তা হলে যেন নিজ নিজ ডেরায় থাকে—যারা বাইরে ভিড় জমাবে তারা টীকে পাবে না।

ক্যাম্প ইন্‌স্‌পেক্টর একটা চুরুট ধরাইয়া কহিল,—বুদ্ধিটা ভালই বাত্‌লেছেন। আমি ডাক্তারবাবুকে আবার ডেকে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, ডি, সি বলে গেলেন, আজই যাতে আরো কয়েকজন ডাক্তার আসে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

—শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। এখনকার মতো সবে-ধন নীলমণিটিকেই ডেকে পাঠান। আর তিনি এলেই যেন আমি একটা খবর পাই। আচ্ছা, আসি এখন।—বলিয়া প্রভাত বাহির হইয়া গেল।

প্যারি-বনের আগুনের মতো হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়িল কলেরা। কয়েক ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই ভয়াবহ মহামারী রূপে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়া দিল।

ডাক্তার বাবুর আসিতে বিলম্ব হইল না। একধার হইতে সেড়ে সেড়ে ঘুরিয়া তিনি টীকা দিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু এই আঠারো বর্গ মাইল ক্যাম্পের সর্বত্র ঘুরিয়া একদিনের মধ্যে টীকা দেওয়া শেষ করা যে নিতান্তই অসম্ভব! তবে এইমাত্র ভরসা, ডি, সি, সাহেব নাকি আরো জনকয়েক ডাক্তার পাঠাইবেন আজ।

শীতের অপরাহ্ণ। ক্যাম্পের পূর্ব-গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একজন বর্মী যুবতী। মুখখানি তাহার ম্লান। চোখ দুটি তীব্র উৎকণ্ঠায় কেমন যেন বিহ্বল। যুবতীর পিছনে তাহার মালপত্রবাহী এক বৃদ্ধ বর্মী।

একজন ভলানটিয়ার আগাইয়া আসিল। যুবতীর আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—আপনি কী এই ক্যাম্পে আস্‌ছেন ?

—হ্যাঁ। যুবতী অনুনয় প্রকাশ করিল: দয়া করে একটা খবর বলতে পারেন আমাকে ?

—বলুন।

—কাল কিম্বা তার আগের দিন যারা এখানে এসেছে তারা সবাই কী ছাড় পেয়ে গেছে ?

—না, এখনও আট ন'দিনকার আগের লোকও জমা হয়ে আছে। কাল কি পরশু যারা এসেছে, তাদের যেতে এখনও ঢের দেরী।

পলকে যুবতীর চোখে আশার বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক মারিয়া গেল: আপনাদের এন্‌কোয়েরী অফিসটা কোথায় ?

—ওই দিকে; কিন্তু কেন বলুন তো ?

—আমি একজন ইভ্যাকুয়ির খোঁজ করতে চাই।

—কিন্তু অফিসে খোঁজ করে তো কোনো লাভ হবে না।

—কেন, ইভ্যাকুইজদের কী কোনো রেজিষ্টার নেই ?

—না, এই হাজার হাজার লোকদের নাম-ধাম কে লিখতে যাবে বলুন! আমাদের মতো ভলানটিয়াররাই শুধু জানে কোন্ দলটি কোন্দিন আসে, আর কোন্ দলকে কবে পাঠাতে হবে।

—আচ্ছা, বলতে পারেন বাঙালীদের ক্যাম্প কোন্দিকে ?

—মুস্কিলে ফেল্লেন আমাকে।—বর্মী ভলানটিয়ার একবার একটু হাসিল: বাঙালীদের একটা নির্দ্দিষ্ট ক্যাম্প বলে তো কিছু নেই। বিস্তর ঘর পড়ে রয়েছে ক্যাম্প জুড়ে। বাঙালীরাও তেমনি এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

—একজন শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক,—মাথায় বড় বড় চুল; দেখতে লম্বা সুশ্রী; পরণে ধুতি পাঞ্জাবি; দেখেছেন কী ঢুকতে ?

—স্মরণ হচ্ছে না ঠিক। তাঁরই খোঁজ করতে চাইছেন বুঝি আপনি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এই হাজার হাজার লোকের ভেতর তাঁর কী খোঁজ পাবেন ? তার ওপর যা কলেরা আরম্ভ হয়েছে! কেউ তো বড় একটা সেডের বাইরে বেরই হয় না।

কলেরা! মুহূর্তে কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল বর্মী যুবতী। আশঙ্কা-ভীরু মুখখানা তাহার তীব্র কাতরতায় ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কী ভাবিয়া আগাইতে সুরু করিল গেটের দিকে।

—একটু দাঁড়ান।—নম্রভাবে বাধা দিল ভলানটিয়ার: টীকে না দেবার আগে কাউকে ঢুকতে দেওয়া বারণ হয়ে গেছে। হেল্থ্ অফিস থেকে এক্ষুনি লোক আসবে; দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।

বর্মী যুবতী থামিয়া দাঁড়াইল। তাহার মালপত্রবাহী বৃদ্ধ লোকটি আগাইয়া আসিয়া স্নেহার্দ্র গলায় বলিল: চল মাথিন, ওই গাছটার গোড়ায় গিয়ে একটু বসবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বল?

সজল হইয়া উঠিয়াছিল মাথিনের চোখ দুটি, মুখ তুলিয়া সে তাকাইল বৃদ্ধের পানে: বাহান! এখন কী হবে?—বলিয়াই মাথিন উদ্গত কান্নার আবেগ দমন করিবার জন্য হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল।

টীকা নেওয়ার পর্বটা শেষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মাথিন থলিটা হইতে টর্চ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল। সঙ্গে চলিল বাহান।

মৃত্যুমগ্ন ক্যাম্পের বুক চিরিয়া নানাদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে, আজানের গম্ভীর ধ্বনি। দূরে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে—ইরাবতীর তীরে একটা চিতা জ্বলিতেছে হয়তো। সম্মুখ দিয়া কে একজন ব্যাগ হাতে সশব্যস্তে সোজা দক্ষিণ দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে দু'জন বর্মী ভলানটিয়ার। কী জানি কেন আজ একটা অস্বাভাবিক রূপই পরিগ্রহ করিয়াছে প্রকৃতি—ইতিমধ্যেই কুয়াশা জমিয়া সবকিছুই অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখের বিসর্পিল পথটা দিয়া কয়েকজন মেথর টানিয়া লইয়া চলিয়াছে গোটা কয়েক শবদেহ—কিন্তু কোন্‌দিকে তাহা কে জানে।

ডানদিকে কয়েকখানা সেড। সেডের বাহিরে একদল মুসলমান নমাজ পড়িতেছে। অদূরে একটা শিরীষ গাছ। গুটি কয়েক ছেলে মেয়ে লইয়া একজন কোরঙ্গী রমনী তাহার নিচে কেন যে আশ্রয় লইয়াছে কে বলিতে পারে। সম্মুখের পাহাড়ের নিচেকার সেডখানির ভিতর হইতে হারিকেনের আলো বাহিরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে বেড়ার ফাঁক দিয়া। মাথিন দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে নোয়াখালী-

বাসী একজন বৃদ্ধ সম্মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাবে চাই আপনার ?

কোন উত্তর না দিয়াই আবার মাথিন চলিল, সঙ্গে চলিল বাহান।

সমতলভূমি। পাশাপাশি সেডের সারি। এদিকে ওদিকে জ্বলিতেছে বিচ্ছিন্ন দু একটা উনুন। মাথিন নীরবে একটার পর একটা সেড দেখিযা চলিল। কয়েকজন সুরাটী যুবক বাহির হইয়া বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মাথিনের দিকে চাহিয়াই রহিল।

বাম দিকে ঘুরিয়া অগ্রসর হইয়া, চলিল মাথিন আর বাহান। ছোট একটা টিলার উপর একখানা অন্ধকার সেড। তাহার পাশ দিয়া যাইতেই একটা উৎকট দুর্গন্ধ নাকে ভাসিয়া আসিল। খানিকটা গিয়া একটা বাঁক ঘুরিতেই দেখা গেল একদল মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িতেছে। তাহাদের সম্মুখে শুভ্রবস্ত্রে আবরিত একটা মৃতদেহ—পাশেই একটা কবর ক্ষুধায় হাঁ করিয়া আছে। চকিত শিহরে মাথিনের টর্চ নিভিয়া গেল।

তাহারা আগাইয়াই চলিল। কে একজন তাহাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল : ওদিকে যাবেন না। কলেরায় বড্ড লোক মরছে।

—ওদিকে কী বাঙালীদের কোনো সেড নেই ?—কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল মাথিন।

—না। সবগুলিই প্রায় কৌরঙ্গীর সেড্।—লোকটি চলিয়া গেল হন হন করিয়া।

মাথিন ফিরিয়া বাঁদিকের পথ ধরিয়া চলিল। তৃণাকীর্ণ অপ্রশস্ত পথ। সম্মুখ দিয়া কয়েকজন মেথর কী কতকগুলি দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া

আসিতেছে তাহাদেরই দিকে। কাছে আসিতেই মাথিন শিহরিয়া উঠিল। বাহান মাথিনের হাত ধরিয়া পথের একধারে গিয়া দাঁড়াইল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ধীর মন্থর পায়ে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল মেথরের দল। পিছু পিছু চলিয়াছে কয়েকটি কুকুর। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের লোভাতুর দৃষ্টি যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে শব-দেহগুলির উপর।—ফালি ফালি লালা-সিঞ্চিত জিভে মধ্যে মধ্যে সলোভ শব্দ হইতেছে।

কিছুদূর গিয়া খনিকটা পরিষ্কার ফাঁকা যায়গা। কী একটা বড় গাছের নিচে আসিতে না আসিতেই একটা গোঙানীর শব্দে মাথিন চমকিয়া উঠিল। টর্চের তীক্ষ্ণ আলোয় সে দেখিতে পাইল, সম্মুখে রাস্তার উপর উবুর হইয়া পড়িয়া একটি রমণী করুণ ভাবে গোঙাইতেছে। মাথিন আগাইয়া গেল তাহার দিকে। রমণীটি তাহার পদশব্দ শুনিয়াই বোধকরি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। আকুল কান্নার ভিতর দিয়া দূর্বোধ্য ভাষায় সে যাহা বলিল তাহা মাথিনের বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না এতটুকু। তাহার পুত্রকে মেথরেরা কোথায় লইয়া গেছে তাহা মাথিন কেমন করিয়া শোকাতুরা জননীকে বুঝাইয়া বলিবে—আর কেমন করিয়াই বা মৃত পুত্রকে সে ফিরাইয়া আনিয়া দিবে মায়ের কোলে? মাথিনের কাতর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নীরবে তাহার হাত ধরিয়া বাহান ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল।

অন্ধকার জমাট বাধিয়া উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে ঘনাইয়া উঠিয়াছে শীতের গাঢ় কুহেলি। আঁকা বাঁকা পথে পথে অগনিত সেড ঘুরিয়া ক্যাম্পের পূর্ব দক্ষিণ কোণে আসিয়া পড়িল তাহারা। নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে মাথিন। বৃদ্ধ বাহানের পানে তাকাইয়া সে করুণ কণ্ঠে কহিল; এখনো যে ওঁকে খুঁজে পেলাম না বাহান।

বাহান ম্লান হাসিয়া আশ্বাস দিল : কথা দিচ্ছি, মলয়বাবুকে খুঁজে আমি বের করবই। তুমি ভেবেনা লক্ষ্মীটি!—বলিতে না বলিতেই তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। খুঁজিয়া পাইলেই তো বিপদ; মাথিনকে তখন কী তাহার হৃদয় উজাড় করিয়া দেওয়া স্নেহ-মমতার ডোরে সে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? তাহার ছল ছল চোখ অন্ধকারে মাথিনের চোখে পড়িল না।

সম্মুখে একটা চৌমাথা। দুদিক হইতে দু'টি আঁকা বাঁকা সরু পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সমস্বরে 'সীতা-রাম' নাম লইতে লইতে পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছে কয়েকজন অবাঙালী। সকলেরই সিক্ত-বস্ত্র। শ্মশানের কাজ শেষ করিবার পর ইরাবতীতে স্নান করিয়া ফিরিতেছে তাহারা। সর্বাঙ্গ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে; যেন দুরন্ত শীতের তাড়নায় রায়-বেঁশে নাচ নাচিতেছে দেহের গ্রন্থিসংস্থানগুলি।

চৌমাথা অতিক্রম করিতে না করিতেই একজন কৌতূহলী বর্মী ভলানটিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল : আপনি কী এই আসছেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকে তো কোনো খালি সেড নেই। এদিকে দু'একটা নতুন সেড করা হয়েছে আজ। আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

—আমি একজন বাঙালী ভদ্রলোককে খুঁজছি।

—ও; কিন্তু এই রাতে কী তাঁকে খুঁজে পাবেন? কি বললেন বাঙালী ভদ্রলোক? নাম কী বলুন তো মিষ্টার প্রভাত চ্যাটার্জি?'

—না, মিষ্টার মলয় মুখার্জি।

—তাঁকে অবশ্য চিনি না। তবে এক কাজ করতে পারেন; ওই যে লম্বা গাছওয়ালা পাহাড়টা দেখছেন, ওর ওপরকার সেডটায় মিষ্টার চ্যাটার্জি

তাঁর কয়েকজন বাঙালী বন্ধুবান্ধবসহ রয়েছেন। তিনি হয়তো মিঃ মুখার্জির খোঁজ দিলেও দিতে পারেন ; বাঙালী ভদ্রলোক বলছেন যখন।

—ওই ওদিককার কয়েকজন লোকও তাই বললেন। আমি এদিকে সেই উদ্দেশ্যেই আসছি।—বলিয়া মাথিন আগাইয়া চলিল।

প্রভাতের দলের অনেকেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরেশবাবু ইন্‌জেক্‌সন্‌ লইবার পর নিরুদ্বেগ তৃপ্তিতেই যেন নাক ডাকাইতেছেন। বিকাশ ইতিহাসের লোক হইলেও মধ্যে মধ্যে একটু সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকে। এই মুহূর্তে সে শুইয়া শুইয়া মহামারীর একটা গল্প খাড়া করিবার জন্য প্লট্‌ খুঁজিয়া মরিতেছে। সম্মুখে জলন্ত হারিকেন রাখিয়া প্রভাত বিছানায় বসিয়া টীকার উপর লবণের সেঁক দিতেছে—ব্যথায় নাকি শরীরটা শীত শীত করিতেছে তাহার। পাশেই সিরাজ, আপাদ-মস্তক লেপে ঢাকা—ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কি জাগিয়া আছে বুঝিবার উপায় নাই। বৃদ্ধ মিয়াজান তখনও সেডের এক কোণে তস্‌বিহ্‌ হস্তে ধ্যানে মগ্ন। দক্ষিণ দিকের বেড়ার পাশের বিছানাটাই কেবল শূন্য পড়িয়া আছে, তাহার উপরে ভায়োলিন কেসটি—ডালাখানি খোলা।

—এখানে মিষ্টার প্রভাত চাটার্জি আছেন কি ?

দরজার মুখে নারী কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিতেই প্রভাত চমকিয়া উঠিল। হাত হইতে বিছানার উপর পড়িয়া গেল লবণের পুল্‌টিস। লেপখানাকে শূন্যে উড়াইয়া সচকিতে উঠিয়া বসিল সিরাজ। আর বিকাশ তাহার গল্পের গুছাইয়া আনা এমন সুন্দর প্লট্‌টা নিমেষের মধ্যে গোলাইয়া ফেলিয়া নারী কণ্ঠের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু পূর্ববৎ তেমনি ধ্যানস্থ হইয়াই রহিল বৃদ্ধ মিয়াজান।

ল্যাম্প হাতে দরজার কাছে আসিতেই প্রভাত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মান্দালয়ে প্যাগোডা-হিল্‌সের নিচে অল্পক্ষণের জন্য পরস্পরকে

দেখিয়াছিল উভয়ই। মাথিনও প্রভাতকে চিনিতে পারিল; কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—মলয়...মলয় মুখার্জির খোঁজ জানেন কি?

হতবাক প্রভাত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিকটবর্তী শিরীষ গাছটি দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইল।

পাহাড়টির ঢালু যায়গাটার একপ্রান্তে নিঃসঙ্গ একটা উঁচু গাছ। তাহার গুঁড়ি হেলান দিয়া মলয় দূর পশ্চিম দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে। ধীরে, অতি মধুর ভাবে তাহার ভায়োলিনের তারে তারে স্পন্দিত হইয়া চলিতেছে মানুষের বেদন-সঙ্গীত। অপূর্ব সুরধ্বনি। দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, বিরহ-বেদনা, নিরাশা-ক্লান্তি—মানব মনের সমস্ত হাহাকার, সমস্ত দুঃসহতাই সঙ্গীতাকারে সুর-মুর্ছনার ভিতর দিয়া প্রকাশ কামনা করিতেছে যেন।

মলয়ের আবেগ-ছলছল চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল মাথিনের প্রেম-মূর্তি।—ভায়োলিনখানা চকিতে কেন জানি বিপুল বেদনার উচ্ছল সুর-তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিল। কী অপূর্ব স্বপ্নই না দেখিতেছে মলয়! ধীরে ধীরে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল মলয়ের দৃষ্টি। মাথিনের মূর্তিও গেল মিলাইয়া।

—মলয়...মলয়!

চমক লাগিল ছড়ে—সেই সঙ্গে চকিত একটা ধ্বনি তুলিয়াই ভায়োলিন থামিয়া গেল। পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল মলয়ঃ তুমি!

বাঁধভাঙ্গা বন্যার উচ্ছ্বাস মাথিনের কণ্ঠ কাঁপাইয়া তুলিলঃ ম-ল-য়... আমি মাথিন!

আর পরক্ষণেই এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতো মাথিন মলয়ের প্রশস্ত বুকের নিবিড়তায় মিশাইয়া দিল নিজেকে। মলয়ের হস্তস্থিত ভায়োলিনের ছড়টি কোন্ ফাঁকে মাটিতে খসিয়া পড়িল।

অদূরে দণ্ডায়মান বাহানের চোখে-মুখে তখন হাসি-কান্নার অপূর্ব স্পন্দন।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

দু' তিন দিন হইতে একটু যেন স্তিমিত বলিয়াই মনে হইতেছে কলেরার প্রকোপটা। এখনো যাহারা মরিতেছে, তাহারা একান্তভাবেই মরিতে আসিয়াছে যেন। টীকাও যখন তাহাদের দেহের বিষক্ষয় করিতে পারিল না তখন তাহারা টাঙ্গুপের ছাড়পত্রের পরিবর্তে পরলোকের ছাড়-পত্রটাই যে পাইয়া বসিবে তাহা আর এমন বিচিত্র কি! নিতান্তই হতভাগ্য তাহারা।

ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যদিও বা একটু একটু করিয়া আশার সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিল, বাহির হইতে আসিল আর এক চরম দুঃসংবাদ। টাঙ্গুপের পার্বত্য পথে পথে নাকি অগণিত লোক মরিতে সুরু করিয়াছে—কেহ তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া মরিতেছে। কেহ বা চিরকালের মতো ঢলিয়া পড়িতেছে কলেরার তুহিন-স্পর্শে। যুগের দাবী হয়তো এমনি করিয়াই তাহার প্রাপ্য বলি আদায় করিয়া লয়। তাহাই যদি না হইবে তবে চারিদিক হইতে এমন একটির পর একটি প্রচণ্ড হাহাকারের উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস হতভাগ্য মানুষগুলিকে নির্মম বাস্তবের স্থূলতম কঠিন পটভূমিতে আনিয়া আছড়াইয়াই বা ফেলিবে কেন! ভীত-শঙ্কিত পলাতকের দল দিশাহারা হইয়া মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।

বিকাশ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল,—এ নিতান্তই বিধাতার অভিশাপ মলয় বাবু; নইলে আর এমন কোরে একটির পর একটি বিপদ আসে!

মলয় শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—বিধাতার অভিশাপ না বলে একে

শতাব্দীর অভিশাপই বলা উচিত বিকাশ বাবু। যখন প্রতি পদে পদে মরণ আমাদের শাসিয়ে চলেছে, পৃথিবী জুড়ে যখন প্রচণ্ড হাহাকার আর রক্তস্রোত—নিশ্চিন্ত মনে একটুও যখন সুন্দরের ধ্যান করবার উপায় নেই, তখন এ শতাব্দীর অভিশাপ নয়তো কি।

সুরেশবাবু সিগারেটে একটা লম্বা টান মারিয়া বলিলেন,—অত সব বড় বড় কথা বিশেষ বুঝিনে! তবে এটা যে একটা অভিশাপ তাতে আর কারো সন্দেহ নেই, সে যারই হোক; আর এই অভিশাপেই দেখছি শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেও বাঁচতে পারবো না। যা একখানা পথ! টাঙ্গুপের পথ তো নয়, যেন মহাপ্রস্থানের পথ!

মাথিন চা পানান্তে রুমালে মুখটা মুছিয়া একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল,—বেশ তো লোক আপনারা, বাংলাতে কথাবার্তা চালিয়ে আমাকে একেবারে একঘরে কোরে রেখেছেন!

সুরেশবাবু হাসিলেন: মাপ করবেন; বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম মিস্ থিন। আসলে কি জানেন, মনে একটু উচ্ছ্বাস এলে ইংরেজী হিন্দিতে আর কুলোয় না।

বিকাশ চায়ের পেয়ালাটি মাটির উপর নামাইয়া রাখিয়া কহিল,—এবার থেকে আপনি কাছে থাকলে আমরা ইংরেজীকেই বাহন করে বসবো; ভুল হবে না।

কোথা হইতে সিরাজ ও প্রভাত আসিয়া হাজির হইল।

কোটটা খুলিতে খুলিতে সিরাজ কহিল, একি, তোমরা আমাদের ফেলেই চা-টা খেয়ে ফেললে!

বাধা দিয়া সুরেশবাবু কহিলেন,—দেখ সিরাজ, আমরা একটা ওথ্ নিয়েছি, মিস থিনের সামনে আর বাংলায় কথাবার্তা চালবো না। এসো ওথ্ টেকিং সেরিমনিটা হয়ে যাক—

সিরাজ হাসিতে হাসিতে বলিল, বেশ তো।

প্রভাত হাসি-মুখে স্থরেশ বাবুর পাশে আসিয়া বসিল এবং ফিরদৌসের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া কহিল, একটা খবর আছে।

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল। স্থরেশবাবু কহিলেন,—খবর, তা স্থ হলে বলতে পারো।

—ডি, সি-র সঙ্গে দেখা হল এইমাত্র। তিনি বললেন, কাল থেকে আর কোনো রেস্‌ট্রিক্সন থাকবে না—খুসী মতো লোক যেতে পারবে।

—বাঃ, তা হলে কালই রওনা হওয়া যাক, কী বল ?

—আমারও তাই মত ; যে-ভাবে টাঙ্গুপের পথে লোক মরতে স্থরু করেছে, তাতে দেরী করলে পথ বেয়ে আর চলবার যো থাকবে না পচা গন্ধে। তবে কাল গেলে প্রচণ্ড ভিড়ের একটা ধাক্কা সইতে হবে কিন্তু।

—তা হোক, ভিড়ের জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না ; চল কালই বেরিয়ে পড়ি এই ইন্‌ফার্‌নো থেকে।

—বেশ। চা-টা খেয়ে আপনারা কেউ প্রোম-মার্কেট থেকে বাজারটা করে আসুন গে ; আর আমি দেখি ওপারে যেতে পারি কিনা।

—ওপারে !

—পরপারে নয় স্থরেশবাবু ; নদীর ওপারে—পেডাঙে।

—কিন্তু কেন ?

—আগে থেকেই দু' একখানা গরুর গাড়ি যোগাড় করলে ভাল হবে। কাল সকালে ওখানে গিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে গেলেই হেঁকে বসবে বেটাচ্ছেলেরা। তার ওপর আবার মেয়েছেলে দেখলে তো কথাই নেই।

কী ভাবিয়া মাথিন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। শান্তকণ্ঠে ডাকিল : ও বাহান, শুনে যাও।

বাহান তখন উনুনটির পাশে বসিয়া দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে চা পান করিতে ব্যস্ত। মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, এই যে আসছি।—বলিয়া এক চুমুকে বাকী চা-টা শেষ করিয়া মাথিনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল: কী বলছো?

মাথিন ধীর কণ্ঠে কহিল, আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে বাহান। কালই রওনা হচ্ছি।

বাহান ভাঙ্গা গলায় বলিল, কাল যাবে!—বলিয়া সে নীরব নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে অশ্রুসজল চোখ তুলিয়া কম্পিত রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমাকেও নিয়ে যাওনা মাথিন। মা মরার পর কোলে পিঠে তোমায় মানুষ করলাম; আর আজ বুঝি আমাকে এমনি কোরে শাস্তি দিতে হয়! তোমায় ছেড়ে আমি থাকবো কী কোরে বল?

মাথিন সান্ত্বনা দিয়া কহিল, মলয়কে না পেলে তোমাকেই তো নিয়ে যেতাম। কিন্তু যখন ওকে পেয়ে গেছি তখন তুমি বাড়ী ফিরে গেলেই তো পারো। ভেবে দেখলাম, তুমিও চলে এলে বাবাকে সান্ত্বনা দেবার কেউই আর থাকবেনা বাহান। তুমি ফিরে যাও; বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ো। আমি কথা দিচ্ছি, ছয় মাস অন্তর তোমাদের দুজনকেই এসে দেখে যাবো।

বৃদ্ধ বাহানের কুঞ্চিত ঠোঁট দুটি নিরুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল থর থর করিয়া। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার সে তাকাইল মাথিনের পানে। তারপর মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে চলিয়া গেল।

সাত

ইরাবতীর পশ্চিম তীরবর্তী পেডাং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত-সীমা হইতে সুরু হইয়াছে টাঙ্গুপের পার্বত্য-পথ। বর্মা এবং আরাকানের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে সড়কটি প্রস্তুত করিয়াছে। একশ' দশ মাইল দীর্ঘ এই পথটি পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে টাঙ্গুপের দিকে—চলিয়াছে তো চলিয়াছেই। কোথাও স্বর্গের উদ্দেশ্যে সোজা উঠিয়া গেছে, কোথাও বা খাড়া নামিয়া পড়িয়াছে পাতালগর্ভে। আবার কোথাও কোথাও বন্ধুর উপত্যকার উপর দিয়া বাঁকের পর বাঁক রচিয়া চলিয়াছে। এই সুপ্রশস্ত পথের দুই পাশে গভীর জঙ্গল আর আকাশস্পর্শী পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝে মাঝে অতলান্ত গভীর খাদ। আর দুই ধারে যতদূর তাকানো যায় শুধু স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—গর্জ্জন, সামালিশ এবং শিরীষ প্রভৃতি নানা বৃক্ষের সারি—কোথাও বা বিস্তৃত কালি-বাঁশের বন—হাওয়ায় মুখর। এই পথে চলিবার সময় যে মরণের মুখোমুখি হইতে হয়না এমন নয়—পথের ধারের ঝোপ-ঝাপ কিম্বা লতার চাঙের আড়াল হইতে যখন তখন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আবির্ভাব ঘটে। কোথাও কোথাও মর্কটজাতীয় জীবগুলি বিকট চীৎকার করিয়া গাছের ডালপালা মাতাইয়া তোলে, উপরের দিকে চাহিলেই ভেংচি কাটিয়া সাবধান করিয়া দেয়। কিন্তু কাহাকেও যদি একা পাইয়া বসে তবে মুখ বিকৃত করিবার বদলে হুড়মুড় করিয়া পথে নামিয়া উহারা তাহাকে আক্রমণ

করে—সুড়সুড়ি দিয়া হতভাগ্যকে হাসাইতে হাসাইতেই মারিয়া ফেলে!

এই দীর্ঘ পার্বত্য পথের যে-বৈশিষ্ট্যটি পথিকদিগকে রীতিমতো ভাবাইয়া তোলে তাহা ইহার জলশূন্যতা। সঙ্গে পানীয় জল না লইয়া এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার কল্পনাটাও করা যায় না। নানা বিপদ স্বীকার করিয়া পথ হইতে বহু নিচে নামিলে কদাচিৎ কখনো পাহাড়ের গা চোঁয়াইয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা পান করিয়া উপরে উঠিতে না উঠিতেই আবার তৃষ্ণা পাইয়া বসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর এই বিন্দু বিন্দু চোঁয়ানো জল দ্বারা কোন পাত্র পূর্ণ হইলেও তাহা লইয়া খাড়া উপরে উঠিয়া আসাও একপ্রকার অসম্ভব। তাই এই পথে জল নামক পদার্থটি দুষ্প্রাপ্য না বলিয়া অপ্রাপ্য বলিলেই যেন চুকিয়া যায়।

আর এই জলহীন ভীতি-সঙ্কুল পথ ধরিয়াই সুরু হয় পলাতকের দুঃখের যাত্রা।

শ্রোম ক্যাম্পের অবরোধ হইতে মুক্তি পাইয়া পলাতকেরা এই পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করে। দলে দলে, কাতারে কাতারে তাহারা চলে—এই চলা এক অদ্ভুত চলা। পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কাহারো অবকাশ নাই। অফুরন্ত পথ চলিতে হইবে, তাই কাহারো জন্য কেহ থামিতে চায়না। চলার নেশায় সবাই অনাহারে অনিদ্রায় আগাইয়া চলে। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন হইলে পথের ধারেই তাহারা একটু ঘুমাইয়া লয়। কাহারো অন্ন জোটে, কাহারো জোটেনা। যাহাদের জোটে তাহাদের না জুটিবারই মতো। নীড়ের টানে তাহারা আগাইয়াই চলে। দুর্ভাগা যাহারা মুক্তপক্ষ মেলিয়াও তাহারা অব্যাহতি পায়না—প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি কিম্বা ক্ষুব্ধ কালবৈশাখীর ঝাপটে ডানা ভাঙ্গিয়া তাহারা চলন্তিপথেই মৃত্যুর বুকে ঝরিয়া পড়ে।

এতদিন পলাতকের যে-ক্ষীণ ধারাটি বহিয়া আসিয়াছে, অকস্মাৎ একদিন তাহা উচ্ছ্বসিত উদ্দাম প্লাবনের আকার ধারণ করিয়া বসিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী,—এক বিরাট জনস্রোত অনন্ত জোয়ারের মতোই এই পথ দিয়া বহিতে সুরু করিয়া দিল। প্রভাতের দলটিও সেই দিনকার অজস্র পলাতকের মিছিলে মিশিয়া গিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

এই পথে কখনো সখনো দু'একটা গরুর গাড়ীর চলাচলও যে চোখে পড়েনা এমন নয়। কিন্তু বিপর্যস্ত সর্বহারা পলাতকের মধ্যে কয়জনই বা গাড়ী ভাড়া করিতে পারে। যাহারা পারে তাহারা প্রয়োজনীয় সব কিছুই বহন করিয়া লইয়া যায়। প্রভাতেরা তিনখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়াছিল। একখানাতে কয়েকটি শূন্য কেরোসিনের টিন—পানীয় জলে পূর্ণ। অপর একখানা তাহাদের মালপত্রে বোঝাই। তৃতীয়খানা মাথিনের জন্য। দলের অন্যান্য সকলে গাড়ীর পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলে। এই পথ দিয়া দিনে গড়ে পনের মাইল করিয়া অগ্রসর হওয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিলেই পথের পাশে তাহারা ডেরা পাতিয়া বসে—উষার প্রথমালোকের আভাস সূচিত হইতে না হইতেই আবার সুরু হইয়া তাহাদের যাত্রা! গরুর গাড়ীতে স্বভাবতই কিছু বিলম্ব হয়—পায়ে হাঁটিয়া যেখানে সাত আট দিনে সমস্ত পথটা পাড়ি দেওয়া যায় সেখানে গাড়ীতে নয় দশ দিন লাগিয়া যায়।

তখন অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে।

একটা বাঁকের মোড়—খোলামেলা স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথের পাশেই বাঙালীর একটা দল রাতের জন্য ডেরা পাতিয়াছে। দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে কয়েকটি আগুনের কুণ্ড। প্রচণ্ড শীতের ঠাণ্ডা সরিতে

না পারিয়া কয়েকজন সেইগুলি ঘিরিয়া বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিয়া গেছে। কেহ কেহ আগুনে বেগুন পোড়াইয়া লইতেছে। পেডাং হইতে তাহারা যে-ভাত রাঁধিয়া আনিয়াছে তাহাতে এ বেলা কোন প্রকারে চলিয়া যাইবে। কয়েকজন শুকনো পাতা বিছাইয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে তীব্র ক্লান্তিতে। আবার কেহ কেহ খানিকটা দূরে দলবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড একটা পাথরের ধারে 'এশারের' নমাজ পড়িতেছে। দূর হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে বাঘের ডাক। পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাহারই প্রতিধ্বনি গম গম করিয়া ফিরিতেছে। সম্মুখের চড়াইয়ের মুখে কৌরঙ্গীর একটা দল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের বিচিত্র কলকণ্ঠ শোনা যাইতেছে।

রহমান বেগুনের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল,—এই কয়েক মাইল আইতেই যখন এত মড়া দেইখ্‌লাম তখন সামনে যে কী দেখুম আল্লায় জানে।

বিড়িতে একটা লম্বা টান মারিয়া আমিন কহিল,—এতক্ষণ যা দেইখ্‌ছো সব ওলাওঠার মড়া। সামনে রঙ বেরঙের মড়া দেখ্‌ইবা আর কি—যারে কয় মড়ার বাহার!

—আমার কি মনে হয় জানোনি? সাম্‌নে মড়া ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া হাঁটতে হইবো। নাকে কাপড় গুইজা চইল্‌লেও আর রেহাই পাইবা না —পচা গন্ধে আধা পথে না আমাদেরও দম্ আইট্‌কা মইরতে হয়!— আহ্‌মদ কুণ্ডে কতকগুলো শুকনো ডালপালা চাপাইতে চাপাইতে কহিল।

আবু একটা বস্তার ভিতর হইতে কয়েকটি লঙ্কা এবং পিঁয়াজ বাহির করিয়া আমিনের পাশে আসিয়া বসিল। তারপর গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিল,—মড়ার কিচ্ছা শুইনলে তো আর প্যাট ভইরবোনা। ক্ষিদায় যে প্যাটের নাড়ী চোঁ চোঁ কইর্‌তেছে।

আমিন মুখের বিড়িটা কুণ্ডে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল: বাইগন্ তো পোড়ান হইছে চাচা। পিঁয়াজ আর মরিচগুলা কাইটা নাও। আমি ভাতের ডেকচিটা বাইর কইরা আনি। ভাতগুলা গন্ধই হইয়া গেছে কিনা কে জানে।

—আর গন্ধ! কাইল থাইকা এই গন্ধ ভাতই বা আর পাইতেছ কোথায়! ভাজা চাইল চিবাইয়াই যে প্যাট ভরাইতে হইবো।—বৃদ্ধ পিতা আজমৎ অপর পার্শ্ব হইতে উত্তর দিল।

এমন সময় পিছন হইতে গরুর গাড়ীর বিকট 'ক্যাঁ-চ ক্যাঁ-চ' শব্দ ভাসিয়া আসিল।

রহমান বলিল,—প্রভাতবাবুর দল নিশ্চয়ই। সেই কোথায় তাদের ছাড়ি আইলাম, আর ঘণ্টা না ঘুইরতেই এতটা পথ আইসা গেল! তাজ্জব এদেশের গরুগুলা!

দলিল নিকটেই একটা চট বিছাইয়া শুইয়াছিল। কাঁথাখানা কণ্ঠ অবধি টানিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল,—একই দিনে যে এমন একটা লোকের সঙ্গে যাইবার পারতেছি এইটা কিন্তু নছিবের জোর বইলা মনে করণ উচিত।

—তা যা কইছ দলু। লোকটার দিল্ আছে। উনি কাছে থাইক্লে যেন কোনো ডর-ভয় থাকেনা।—আবু মিয়া কুচি কুচি করিয়া পিঁয়াজ কাটিতে কাটিতে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল। পিঁয়াজের ঝাঁজ লাগিয়া তাহার চোখ দুটি সজল।

প্রভাতের দলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পড়িল। সিরাজের নির্দেশে গাড়োয়ানেরা পথের একপাশে গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। গাড়ীর ভিতর হইতে রন্ধনের পাত্রাদি নামাইতে লাগিয়া গেল বৃদ্ধ মিয়াজান ও ফিরদৌস। রহমৎ আর কালু আরম্ভ করিয়া দিল উনুন খুঁড়িতে। সিরাজ

খুশি হইয়া বলিল,—বাঃ, খাসা জায়গাটা! রাত্রে সোয়াস্তিতে ঘুমোনো যাবে অন্তত।

বলিয়া, মনের খুশিটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে গান জুড়িয়া দিল :

তোর পথ জানা নাই, নাই বা জানা নাই,
ও তোর মনের মানা নাই,
ও তুই সবার সাথে চলবি রাতে
সামনে চাহি রে—
আর সময় নাহি রে।

সুরেশবাবু ওভারকোটটা খুলিয়া ফেলিলেন : ওঠানামা করে যা ক্লান্ত হয়েছি তাতে বিছানাটা পের্তে শোবারও সবুর সইবেনা দেখছি। যা একখানা ঘুম হবে—বাঘে টানলেও টের পাবো না।

—পনেরো ষোলো মাইল হেঁটেই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুরেশবাবু? জাভাতে আমি প্রায়ই কুড়ি পঁচিশ মাইল হেঁটে বেড়িয়েছি।—মলয় মৃদু হাসিল।

—আপনাদের কথা ছেড়ে দিন মশায়, শিল্পী মানুষ আপনারা, হাওয়া খেয়ে বাঁচেন। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যান। তা যা হোক্, খেয়ে-দেয়ে একটা কিছু শোনাতে হবে কিন্তু আমাদের। আপনার বাজনা শুনে ঘুমোতে পারলে দুঃস্বপ্ন থেকে বেঁচে যাবো। পথে পথে যে সব ব্যাপার দেখে এলাম—ওরে বাপ্‌রে!

আহারান্তে সকলেই পথের ধারে বিছানা মেলিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। মলয় প্রকাণ্ড একটা পাথরের উপর বসিয়া ভায়োলিনে বেহাগের একটা আলাপ করিতেছে। তাহার পাশে বসিয়া আছে মাথিন। সুরের স্বপ্নে বিভোর তাহার নীল চোখ দুটি। প্রভাত আর সিরাজের

মুখে সিগারেট পুড়িতেছে। বিকাশ চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে। সুরেশবাবুর সুরের নেশা ধরিয়াছে বোধহয়,—অচল পাথরের মতো পড়িয়া রহিয়াছেন বিছানার উপর। বুক অবধি লেপখানা টানিয়া দিবার শক্তিটুকুও তাহার লোপ পাইয়া গেছে যেন।

দূর হইতে পথ বাহিয়া আগাইয়া আসিতেছে একটা দল। কয়েক জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। ইথারে বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া নাচিতেছে তাহারই আগুন। লালাভ আলোয় চারিদিকের কালো অন্ধকার আরো যেন ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে।

দলটি তাহাদের নিকটে আসিতে না আসিতেই হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে শান্ত হইয়া গেল—সুরের মায়ায় সকলের কলকণ্ঠ নিমেষের মধ্যেই গেল স্তব্ধ হইয়া। মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল তাহারা। তারপর নীরবে দলটি আবার আগাইয়া চলিল। খানিকটা সম্মুখে গিয়া কোথাও তাহারা ডেরা পাতিবে হয়তো। বস্ত্রহীন যাহারা, তাহারা এই শীতার্ত রাতে ক্রমাগত চলিয়াই যেন শরীরটাকে গরম রাখিতে চায়। কিন্তু ক্রমাগত চলিতে চাহিলেও যে চলা যায় না—ক্লান্তি বলিয়া একটা বোধও আছে যে!

দলটি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে না যাইতেই একখানা গরুর গাড়ী আসিয়া দেখা দিল। গাড়ীটার পিছনে পিছনে মশাল হাতে একটা লোক হাঁটিয়া আসিতেছে। গাড়ীর সোয়ারী একজন নারী। ফিস্ ফিস্ করিয়া গাড়োয়ানটাকে কী যেন বলিল সে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গাড়ীটা পথের একপাশে আসিয়া থামিয়া পড়িল। গাড়োয়ানটা নামিয়া বলদ দু'টিকে খুলিয়া ফেলিল। মৃদুকণ্ঠে মেয়েটি ডাকিল, মন্নু মিয়া!

মশাল হাতে লোকটি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি ছইয়ের

ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—শুনা, ক্যায়সি মিঠি হাত! আজ রাত তো ইঁহাই রহ যাউঙ্গি।

মন্নু মিয়াও ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, হাত তো মিঠি হ্যায় খুব! লেকেন ম্যায় সোচ্‌তাহুঁ, ইয়ে হ্যায় কৌন্।

মেয়েটি কিছু আর বলিল না। কেবল তর্জনী তুলিয়া মন্নু মিয়াকে কী একটা ইঙ্গিত করিল—চুপ করিয়া থাকিতেই নির্দেশ দিল হয়তো। মন্নু মিয়া মশালটা নিভাইয়া ফেলিল। গাড়ীর ভিতর হইতে হাতড়াইয়া নিজের বিছানাটা বাহির করিয়া পথের একপাশে পাতিয়া লইল। তারপর কাঁধ হইতে ঝুলানো সারেঙ্গীটা সযত্নে শিয়রের পাশে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল অবসন্ন ভাবে। আর নবাগতা সম্মুখের দিকে তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া অন্ধকারে কাহাকে যেন অধীরভাবে খুঁজিতে লাগিল।

ভায়োলিন তেমনি সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিয়াছে। নবাগতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই কাহারো। যে কয়েকজন এখনও জাগিয়া রহিয়াছে তাহারা সুরের মোহে বিহ্বল। সজোরে একটা ধাক্কা না দিলে চেতনা ফিরিবেনা কাহারো।

নবাগতার বাহ্য-চেতনাটাও ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া আসিতেছে। এমন আকুল-করা সুর, এমন ব্যাকুল ধ্বনি-রেশ সে যে স্বপ্নেও শোনে নাই কোনদিন! রেঙ্গুনের উপর দশ বছর ধরিয়া নিশীথ-আগন্তুকদের নিজের কণ্ঠ-নিঃসৃত যে তান-লয়শুদ্ধ মধুর সঙ্গীতে সে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, আজ সে সবই যেন নিতান্ত নিরর্থক বোধ হইল। তাহার অন্তরে একটা তীব্র অহমিকা-রোধ দানা বাঁধিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজ একটা ফুৎকারেই তাহার সমস্ত গর্ব, সমস্ত ঔদ্ধত্য মুহূর্তে যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেছে।

পথের ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে শুকনো পাতা খস্ খস্ করিয়া

উঠিল—কোন এক চঞ্চলা হরিণী সুরের টানে কান দুইটি সজাগ করিয়া ধীরে ধীরে পাহাড় বাহিয়া নিচের দিকেই নামিয়া আসিতেছে হয়তো।

রাত্রি তখন গভীর। ভায়োলিন থামিয়া গেছে। চারিদিকের নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া এদিকে ওদিকে একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে। ছোট বড় গাছগুলি হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে তলার শুকনো পাতাগুলির উপর। আগুনের ধূনিগুলি তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। একটি হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে—বোধহয় ভুলে কিছু কাঁচা ডালপালা চাপানো হইয়াছিল তাহার উপর। পাথরটার ধারে মলয় ঘুমাইতেছে। পাশেই সারিবন্দী গাড়ীগুলি। একটিতে মাথিন নিদ্রায় মগ্ন। অদূরবর্তী গাড়ীটার মধ্যে সেই নবাগতা মোমের মতো মসৃণ একটা লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে—স্তব্ধ হইয়া যাওয়া ভায়োলিনের সুর হয়তো তখনও তাহার হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। তাহার চোখের পাতায় কিসের যেন আবেশ-জড়িমা।

একটা পাষাণফাটা আর্তনাদে মুহূর্তে সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। সসব্যস্তে উঠিয়া পড়িল সকলে। প্রভাতের হাতে টর্চ জ্বলিয়া উঠিল: অপর দলের বৃদ্ধ আজমৎ তাহার বিছানার উপর দাঁড়াইয়া বিহ্বল ভাবে চারিদিকে তাকাইতেছে—একটি মুহূর্ত পরেই আচমকা শিয়রের নিচ হইতে লম্বা একখানা ঝক্‌ঝকে দা বাহির করিয়াই বৃদ্ধ আজমৎ জঙ্গল চিরিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিল। চারিদিক কাঁপাইয়া ধ্বনিয়া উঠিল তাহার ব্যাকুল-আর্তনাদ: ওরে আমিনরে! শেষে তোরে বাঘে নিল রে!

সকলেই ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে আসিল। প্রভাতের বজ্রমুষ্টি হইতে একটা হেঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করিয়াই আবার দিশাহারা আজমৎ দা-খানা উঁচাইয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিল—"ও বাঘ, তুই কেমন কইরা আমার আমিনরে লইয়া গেলি !

প্রমাদ গণিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাঁক ছাড়িল প্রভাত : কোথায় যাচ্ছ তুমি একা ? দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমরাও যাবো খুঁজতে।

কিন্তু আজমতের কানে কথাগুলি প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহার সম্মুখে যে-অতলস্পর্শী খাদ হাঁ করিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছিল আজমতের উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপ তাহারই ক্ষুধা মিটাইয়া দিল ! বাহিরে ভাসিয়া আসিল একটা অতি ক্ষীর্ণ আর্তস্বর : আ...মি...ন......

পূর্বাকাশে তখন রঙের পরশ লাগিয়া গেছে। প্রভাতদের দলটি চলিতেছে। তাহাদের সঙ্গ লইয়াছে অপর বাঙালী দলটি। সকলের পিছনে নবাগতার গরুর গাড়ীখানিও চলিয়াছে আগাইয়া। এদিক ওদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বন্য মোরগের ডাক। চারিদিকে বনের বিচিত্র পাখীগুলির কণ্ঠে প্রভাতীর সুর বাজিতেছে।

বাঁ পাশের গজ্জন গাছটির গুঁড়ি হেলান দিয়া কে একজন পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। পাথরের মতো নিশ্চল তাহার দেহ ; চক্ষু দুটি অর্দ্ধোন্মীলিত। মাথাটা একধারে হেলিয়া পড়িয়াছে।

কিছুদূর গিয়া একটা উৎরাই। খাড়া নামিয়া চলিতেছে সকলে। মাথিন মলয়ের হাত ধরিয়া সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতেছে। গাড়ীগুলি টলিতে টলিতে বিকট শব্দ করিয়া নামিয়া পড়িতেছে। সমস্ত শক্তি দিয়া রাশ টানিয়া ধরিয়াছে গাড়োয়ানেরা—একটু অসাবধান হইলেই মুহূর্তে গাড়ী

উল্টাইয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে—দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে তাহাদের কপাল বহিয়া।

কিছুটা নামিতে না নামিতেই কাহার যেন কাতর-কণ্ঠ কানে আসিল। প্রভাতরা থমকিয়া দাঁড়াইল। পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে একজন বৃদ্ধ পড়িয়া আছে। কী ভাবিয়া প্রভাত সেইদিকে আগাইয়া গেল। মুহূর্তে ব্যাকুল হইয়া উঠিল বৃদ্ধলোকটি। অশ্রু-জড়িত ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—আমারে সবাই ফেলাই গেছে বাবু, আমারে সবাই ফেলাই গেছে! নামতে গিয়া পা-টা মইচ্‌কা যাইতে আমারই ছেলেরা মাঝপথে আমায় ছাড়ি চইলা গেল! বুড়া মানুষ বাবু—

দুঃখের আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হাঁপানীর প্রকোপটা আবার জাগিয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে বুঝি'—তাহার শীর্ণবুকের প্রকটিত পাঁজরগুলি নিঃশ্বাসের সঙ্গে শিথিল চামড়া ফুঁড়িয়া যেন বাহির হইতে চাহিতেছে!

এই রুগ্ন হাঁপানীগ্রস্ত পিতাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে যুবক পুত্রদ্বয়ের চলার গতিবেগ স্তিমিত হইয়া পড়িতেছিল। বৃদ্ধের পা-টা মচকাইয়া যাওয়াতে তাহারা বাঁচিয়াই গিয়াছিল যেন। ছুতা বাহির করিয়া পিতাকে নিঃসঙ্গ পথের ধারে ফেলিয়া যাইতে তাহাদের প্রাণে এতটুকুও অনুকম্পা জাগে নাই নিশ্চয়ই।

প্রভাতকে একটা ব্যবস্থা করিতে হইল। প্রথম গাড়ীটার জলপূর্ণ টিনগুলি অন্য একভাবে সাজাইয়া কোন রকমে এই বৃদ্ধ সম্পান চালকটিকে একটু স্থান করিয়া দিল। বৃদ্ধের কুঞ্চিত ঠোঁট দু'টি কাঁপিয়া উঠিল থর থর করিয়া। আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়াই [illegible] কম্পিত হাত দুখানা তুলিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সে আশীর্বাদ করিল: খোদা তোমার হায়াৎ দারাজ করুক বাপধন।"
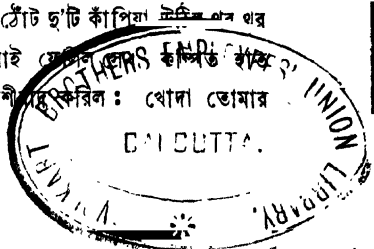
ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। পাতার ফাঁক দিয়া সূর্যের তির্যক রশ্মি পথটির উপর এখানে সেখানে সোনা ছড়াইয়া দিল। আর তাহারা আগাইয়া চলিল ধীর মন্থর গতিতে।

একটা বাঁকের মোড়। একপাশে পাহাড় কোথায় যে উঠিয়া গেছে কে জানে। অপর পাশে বিস্তীর্ণ কালি-বাঁশের বন। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। পথের বাঁ-ধারে একটা পাথর। তাহার পাশে দুজন কোরঙ্গীর শবদেহ। একটি বিবস্ত্র—বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া পড়িয়া আছে। অন্যটির পেট ফাঁড়িয়া কিসে যেন অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে ; চোখের কোটর দুটিও শূন্য।

উপত্যকা। তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে। বাঁ পাশে বহু নিচে এই পথেরই একটা অংশ চোখে পড়িতেছে—সারি বাঁধিয়া আসিতেছে একদল পলাতক। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখান হইতে এখানে আসিতে প্রায় একটা দিন লাগিয়া যায়। অথচ কত নিকটেই না মনে হয়! সোজাসুজি একটা পথ থাকিলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো আসা যাইত। কিন্তু বাঁ পাশের উদ্ধত খাড়া পাহাড় বাহিয়া ওঠে কাহার সাধ্য! মাথিন চলিতে চলিতে বলিল,—কী চমৎকার! ওই পথটা ঘুরে ঘুরে এখানে এসে পড়েছে ?

মলয় বলিল, কী ছোট্টই যে দেখাচ্ছে ওই মানুষগুলোকে—যেন লিলিপুটের দল।

সুরেশ বাবু হাসিলেন : আর ওরা আমাদের কী ভাবছে জানেন মিস থিন ?

—কি ?

—ডেঁয়ের দল। সার বেঁধে কাউকে মরণ-কামড় দিতে চলেছি।

উচ্ছলিত জলতরঙ্গের মতো মাথিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিছুদূর গিয়া একটা চড়াই। চড়াইটার মুখে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট বাঁশের ঘর—দুয়ারখানা খোলা। সরকার কর্তৃপক্ষ এই পথে কয়েক মাইল অন্তর এই ধরণের এক একটা ক্যাম্প-ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটার পাশ দিয়া যাইতেই উৎকট দুর্গন্ধে সকলের দম আটকাইয়া আসিতে চাহিল। বোধ হয় কোন হতভাগ্যের শব গলিতেছে ভিতরে। নাকে কাপড় গুঁজিয়া সকলে চড়াই বাহিয়া উঠিতে সুরু করিল। ডান পাশের একটা আসাম লতার ঝোপ হইতে সর সর করিয়া কী একটা বাহির হইয়া বিদ্যুৎ বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। হয়তো রামকুত্তা,—বাঘ হওয়াও বিচিত্র নয়।

উপরে উঠিয়া পথটা বহুদূর পর্যন্ত সোজা চলিয়াছে। পথের উভয় পাশে নানাবিধ বৃক্ষের সারি। কয়েকটির আগ-ডালে টিয়াপাখীর ঝাঁক চেঁচামেচি করিতেছে।

তখন বেলা ঢলিয়া পড়িতেছে। পথ-শ্রান্তিতে সকলেরই শরীর যেন অবশ হইয়া গেছে। কোন প্রকারে পা টানিয়া টানিয়া চলিতেছে তাহারা। গরুগুলির জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে কিছুটা—মুখের কস বাহিয়া গ্যাঁজলা ঝরিতেছে। খানিকটা সম্মুখে গিয়া আজিকার মতো পথ-চলা তাহারা শেষ করিবে। সকলের পিছনে নারী-যাত্রীটির গাড়ীখানা। পাশাপাশি চলিতেছে মন্নু মিয়া। কাঁধ হইতে সারেঙ্গীটা বোধ করি গাড়ীর ভিতরেই রাখিয়া দিয়াছে সে। পা দুইটা তাহার কিছুতেই যেন চলিতে চাহিতেছেনা আর।

মৃদু কণ্ঠে ডাকিল নারী-যাত্রীটি,—মন্নু মিয়া!

মন্নু মিয়া ছইয়ের মুখে আসিয়া দেখা দিল: কী শোভনা?

—বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছো নিশ্চয়ই ; তুমিও গাড়ীতে উঠে এসোনা !

—বেশ বেশ।—মন্নু মিয়া চলন্ত গাড়ীর পিছনের দিকটায় উঠিয়া পড়িল। তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিল,—কী আজব রাস্তা !

সম্মুখের দিকে চোখ মেলিয়া শোভনা বাঈ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—হাঁ জী মন্নু মিয়া !—উদাস তাহার কণ্ঠ।

—বল।

—কতই না! মন চায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে গান বাজনা সম্পর্কে একটু আলাপ করি। এমন গুণী লোকের দেখা পাওয়াও ভাগ্যের কথা ! কিন্তু—

—কিন্তু আর কী। মন চাইছে, নিজে গিয়ে আলাপ করলেই পার।

—সরিফ লোক। আমার 'সঙ্গে কেন তিনি কথা বলবেন। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবেন যে।—একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার বুকখানা দোলাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

সম্মুখের বাঁকের মোড় ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাথিন সসব্যস্তে হাঁকিয়া উঠিল : কা নিবাও।

পরক্ষণেই চলন্ত গাড়ীগুলি থামিয়া গেল। সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। মাথিন ত্রস্ত জড়িত পদে আগাইয়া গেল ডান পাশের একটা গাছের গুঁড়ির দিকে। একজন আসন্ন-প্রসবা কোরঙ্গী রমণী মাটিতে লুটাইয়া কাতরাইতেছে। অব্যক্ত বেদনায় অস্ফুট আর্তনাদ করিতেছে মাঝে মাঝে। হতভাগিনীটিকে এমন নিঃসঙ্গ ফেলিয়া রাখিয়া তাহার স্বামী কখন যে চলিয়া গেছে কে জানে। তাহার মুদিত চোখ দুটি হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিতেছে। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখ—কপালের শিরাগুলি স্পষ্টতর। মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষিবার কট কট শব্দ। মাথিনের হাতের স্নেহ-কোমল স্পর্শটুকু তাহার কপালে আসিয়া লাগিতেই হতভাগিনী ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। বাষ্পপূর্ণ চোখের ঝাপসা দৃষ্টি। সে মাথিনকে

দেখিতে পাইল কিনা কে বলিবে। তাহার বেদনা-কুঞ্চিত অধর দুটি বার কয়েক স্পন্দিত হইল এবং পরক্ষণেই অস্ফুট আর্তনাদ করিতে করিতে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো একটু বাঁকিয়া উঠিয়াই হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গেল তাহার দেহ।—ক্লেদমাখা একটি শিশু ওঁয়া ওঁয়া করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নিজের আগমন বার্তা প্রচার করিয়া দিল। জননীর উন্মীলিত চোখের স্থির-দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্যই জাগিল না।

মাথিনের চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে তুলিয়া লইল নবজাত শিশুটিকে।

একটা প্রজ্বলিত কুণ্ডের পাশে বসিয়া মাথিন শিশুটির পরিচর্যায় ব্যস্ত। অদূরে কয়েকটি উনুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। কৌরঙ্গী রমনীটিকে সমাধিস্থ করিবার পর রহমৎ, কালু, বৃদ্ধ মিয়াজান, আবুমিয়া প্রভৃতি জনকয়েক পথের একধারে নিবিষ্ট মনে দিনশেষের নমাজ পড়িতেছে। প্রভাত, সিরাজ এবং বিকাশ শ্যাওলা-পড়া একটা পাথরের উপর বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে। পার্শ্ববর্তী একটা গাছের গুঁড়ি ঠেঁস দিয়া বসিয়া কী যেন ভাবিতেছেন সুরেশবাবু। মলয় মাথিনের পাশে বসিয়া পরিচর্যার কাজে সাহায্য করিতেছে। অদূরে শীষ দিতে দিতে সর্ সর্ শব্দে পাহাড় বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে এক ঝাঁক মথুরা পাখীই হয়তো।

মলয় ভাঁজ করা এক-টুকরা কাপড় আগুনের উপর ধরিল : শিশুটাকে তো নিলে, এখন বাঁচাবে কেমন কোরে শুনি ?

—কেন, যেমন কোরে সবাই বাঁচায় তেমনি কোরেই বাঁচাবো।

—তা তো হলো ; কিন্তু কী খাইয়ে বাঁচাবে বল ? এই পথে এতটুকু দুধও তো কোথাও পাবে না ওর মুখে দিতে।

মাথিনের শুভ্র-সুন্দর কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

—শিশুটাকে যদি বাঁচাতেই না পার তবে ওকে নিয়েই বা কী হবে?

—মিছরীর জল খাইয়েও কী—

—মিছরীর জল! তুমি কী পাগল হলে! এখানে মিছরীই বা পাচ্ছ কোথায়?

—তাও তো বটে; তবে কী করবো?

কথাগুলি কানে গিয়াছিল প্রভাতের। কী ভাবিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর নিঃশব্দে মালপত্রবাহী গাড়ীটার ভিতর হইতে একটা সুটকেশ বাহির করিয়া আনিল। সুটকেশটি খুলিয়া কাগজে মোড়া লম্বা কী একটা বাহির করিয়া ধীরপায়ে মাথিনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মোড়া কাগজটি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সে বলিল, আজ আর কাল এই আখের রস খাইয়ে বাঁচাতে পারেন। দুদিন পর ভাতের মাড় পাতলা কোরে ওর মুখে একটু একটু দিলেই চলবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মাথিন তাকাইল: আখ! সুটকেশে কাগজ-মোড়া আখ! আপনাদের দেশে কী আখ পাওয়া যায় না?

—কেন পাওয়া যাবে না।

—তবে যে এমন একটা জিনিষ এত যত্ন কোরে সুটকেশে বয়ে নিয়ে চলেছেন?—মাথিনের চোখে মুখে কৌতুহল ফুটিয়া উঠিল।

মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রত বোধ করিল প্রভাত। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভভাবে হাস্য-তরল কণ্ঠে বলিল: এমন যত্ন কোরে নিয়ে যাচ্ছি বলেই তো আজ আখগুলো কাজে লাগলো।

ইতিমধ্যে সুরেশবাবু, সিরাজ এবং বিকাশ প্রভাতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুরেশ বাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—একটা অদ্ভুত লোক তো তুমি! সেই খুকীর দেওয়া আখটা বয়ে নিয়ে চলেছ! আজ বুঝতে পারছি, সেদিন যখন এই নীরস লোকটা একটু আখের রস খেয়ে রসালো

হয়ে উঠতে চেয়েছিল তখন তুমি কেন আমার হাত থেকে এমন দুর্লভ বস্তুটা ছিনিয়ে নিয়েছিলে।

প্রভাত সহজ হইবার চেষ্টা করিল। হাসিয়া কহিল, আপনার মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম বলেই তো এই শুকনো আখের সামান্য রসটুকু শিশুটির মুখে দিতে পারছি।—বলিয়াই সে মুখ ঘুরাইয়া ডাকিল: ফিরদৌস্ শোনো তো!

সিরাজের কাছে ব্যাপারটা স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কোন কথা না বলিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া শ্যাওলা-পড়া পাথরটির ওপর বসিয়া পড়িল।

প্রভাতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ফিরদৌস।

—আখের টুকরো দুটো ছেঁচে কিছুটা রস বের করতে পার কিনা দেখতো ভাই।—বলিয়া প্রভাত সিরাজের পাশটিতে আসিয়া বসিল।

সিরাজ তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, সেণ্টিমেণ্ট্যাল শুধু আমিই, না প্রভাত?

দু দিন কাটিয়া গেল।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর তাহারা একটা উপত্যকার উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। গলিত শবের দুর্গন্ধ ক্রমেই যেন উগ্র হইয়া উঠিতেছে। পথের ধারে ধারে, এমন কি উপরে পর্যন্ত শবদেহ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে। যত সম্মুখে চলিতেছে ততই যেন ইহাদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। নাকে কাপড় গুঁজিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বাঁ পাশে একটা ক্যাম্প-ঘর। কে যেন আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল—তখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে।

মাঝে মাঝে বাঁশ ফাটার প্রচণ্ড শব্দ। এক অতি উৎকট দুর্গন্ধ নাকে ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ করি কয়েকটা শবদেহও পুড়িতেছে ঘরটির সঙ্গে।

কিছুটা অগ্রসর হইয়া উপত্যকা-পথ মোড় ঘুরিয়াছে। একজন কৌরঙ্গী লাল মাটির একটা ঢিবির পাশে পড়িয়া আছে। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। চোখ দুটি মুদিত, মুখখানি হাঁ-করা। কয়েকটি মাছি ভন ভন করিতেছে মুখের উপর। মুহুর্মুহু জিভখানি নড়িয়া উঠিতেছে লোকটার—এই অন্তিম কালে এক ফোঁটা জলের আশায় বুঝি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে উহা।

প্রভাত জলবাহী গাড়ীটা হইতে একপাত্র জল লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে খানিকটা জল ঢালিয়া দিল লোকটার মুখে। উন্মুখ জিহ্বায় যেন পরম পরিতৃপ্তির স্পন্দন খেলিয়া গেল। কণ্ঠনালী দুয়েকবার থর থর করিয়া কাঁপিল। এবং পরক্ষনেই তাহার বুকখানা একবার দুলিয়া উঠিয়াই শান্ত হইয়া গেল—উন্মুক্ত মুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল চিরদিনের মতো।

তাহারা আগাইয়া চলিল।

সম্মুখে একটা খোলা যায়গা। বাঁ পাশে, নীচে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। সুরেশবাবু রসিকতা করিয়া উঠিলেন: সমুদ্র দেখেছো, সমুদ্র ?

প্রভাত কী যেন ভাবিতেছিল। চকিত হইয়া বলিল,—সমুদ্র !

—হ্যাঁ, ওই যে।

মাথিন গাড়ীর ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে বলিল,—আপনি একজন ভাল সাঁতারু বলে শুনেছি। একবার একটা 'ডাইভ্' কোরেই দেখুন না কেন ?

কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না সুরেশবাবু। সকলকে হাসাইতে গিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা হইতে কী হইয়া গেল। তাঁহার অন্তরে চকিতে কিসের যেন একটা তীব্র ব্যথা জাগিয়া উঠিল। নিজেকে কেন জানি বিরহী যক্ষের মতোই মনে হইল তাঁহার। এই মেঘ—এই শুভ্র মেঘপুঞ্জকে উদ্দেশ্য করিয়া কী এক নীরব ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন তিনি। কিন্তু এই অভিশপ্ত যুগের মেঘমালা কী তাঁহার বার্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবে রানুর সমীপে—দূর অলকাপুরীর ইন্দ্রনীল প্রাসাদের মতো বাংলার একটি মধু-শ্যামল পল্লীগৃহে ?

মাথার উপর দিয়া বিচিত্র ঠোঁট-ওয়ালা একটা ধনেশ পাখী কাঁদিয়া কাঁদিয়া উড়িয়া গেল, হয়তো বা তাহার হারানো সঙ্গিনীটিকেই সে এমন দিশাহারা ভাবে খুজিয়া মরিতেছে !

—

তাহারা চলিয়াছে। পশ্চিমাকাশে বেলা ঢলিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সির সির করিয়া বহিতেছে উত্তরের হিমেল হাওয়া। আজ রাত্রে ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকাইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। কিছুটা অগ্রসর হইয়া প্রভাতের দল হঠাৎ থামিয়া পড়িল। সম্মুখে পথের উপরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে কয়েকটি নিষ্পেষিত শবদেহ। কাহারও জিভ বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; কেহ কেহ ঠিকরাইয়া-পড়া চোখ মেলিয়া পড়িয়া আছে—বিকৃত তাহাদের মুখভঙ্গি। কাহারো কাহারো দেহ প্রচণ্ড নিষ্পেষণে এক একটা মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে—মানুষের দেহ বলিয়া কোন মতেই যেন চিনিবার উপায় নাই। পথের একপাশে একটা উল্টাইয়া-পড়া গরুর-গাড়ী—জোয়ালবদ্ধ গরু দুইটি মুখ থুবরাইয়া পড়িয়া আছে—বুকের পাঁজরগুলি যেন ছাতু হইয়া গেছে ; প্রচণ্ড দলনে বাহির হইয়া পড়িয়াছে পেটের অন্ত্রগুলি। এদিকে ওদিকে

কাপড়ের কয়েকটি পুঁটলি ছড়ানো। একটুকরা শতছিন্ন বস্ত্র অদূচ্চ হরিতকী গাছের একটা ডালের মাথায় লাগিয়া আছে। পথের রাঙামাটির ওপর এখানে সেখানে থকৃথকে জমাট-বাঁধা কালো রক্ত। হঠাৎ একটা কাতর গোঙানি কানে আসিল। সকলেই চকিতে বাঁদিকে তাকাইল। হাত কয়েক দূরে একটা ডলুবাঁশের ঝাড়ের ধারে কে একজন হতভাগ্য পড়িয়া আছে—তাহার বাম উরু ক্ষত-বিক্ষত—তীক্ষ্ণ কোন বস্তুর আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া গেছে—স্থানটি ভাসিয়া গেছে রক্তে। প্রভাত, সিরাজ আর রহমান ছুটিয়া গিয়া তাহাকে সাবধানে তুলিয়া ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী বড় পাথরটির ওপর শোয়াইয়া দিল।

এমন একটা ভয়ানক রক্তারক্তি কাণ্ড কিসে ঘটিল, সকলে সবিস্ময়ে সেই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ এমন সময় পিছন হইতে ফিরদৌস চীৎকার করিয়া উঠিল: হাতী! হাতী! এ সবই হাতীর কাণ্ড! পায়ের দাগ দেখছেন না, এই যে!

মুহূর্তের মধ্যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল প্রায় সকলেই। সিরাজ প্রভাতের পানে তাকাইয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—এ বেচারাকে হাতী পায়ে পিষেণি, শুঁড়ে জড়িয়েও আছাড় মারেনি—কেমন দাঁত চালিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে! কিছুতেই একে বাঁচানো যাবেনা; শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই আর। এত কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে হাতীর পায়ের চাপে মরলেই তো বেঁচে যেতো।

হতবাক প্রভাতের চোখদুটি বেদনায় ছল ছল করিয়া উঠিল।

এমন সময় অদূরের বাঁশবন হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভীতিবিহ্বল মাথিন মুখ লুকাইল মালয়ের বুকে। আতঙ্কে সকলের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া সিরাজ ছুটিয়া গিয়া জলবাহী গাড়ীটা হইতে একটা শূন্যটিন বাহির করিয়া সজোরে পিটাইতে

সুরু করিল এবং পরক্ষণেই আকাশভেদী ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করিয়া বাঁশবন তোলপাড় করিতে করিতে কী একটা জানোয়ার গভীরতর জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল।

প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলিল সিরাজঃ সেরেছিল আর কী! এ যে দল-ছাড়া পাগলা হাতী! তাই তো বলি, পাগলা হাতী না হলে কী আর এত লোকের মাঝখানে এসে এমন একটা হত্যাকাণ্ড বাধাতে সাহস করতো! কী ভীষণ!

অদূরে মন্নু মিয়া তখন বাঁশপাতার মতো থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা উংরাইয়ের মুখের কাছে আসিয়া ডেরা পাতিয়াছে তাহারা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানটি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে তখন অস্তোন্মুখ সপ্তমীর চাঁদটা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। হাত কয়েক দূরে একটা প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ড। বন্য জন্তু-জানোয়ারদের নিকটে ঘেঁষিতে না দেওয়ার জন্যে উহার উপর এত ডালপালা চাপানো হইয়াছে যে, হয়তো সারা রাতই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিবে। প্রায় সকলেই ঘুমে অচেতন। গাড়ীর ভিতরে কালো শিশুটিকে কোলে লইয়া মাথিন তাহার বুকে কি যেন মালিশ করিতেছে। গতকাল হইতে কেমন যেন কাশিতেছে শিশুটি—ব্রোংকাইটিস্ বলিয়াই মনে হয়। ছইয়ের সঙ্গে বাঁধা লণ্ঠনের স্তিমিত আলো মাথিনের মুখের উপর পড়িয়া উৎকণ্ঠার রেখাগুলি স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে। নোয়াখালীবাসী সাম্পান-চালকটির পায়ের ব্যথা অনেকটা সারিয়া আসিয়াছিল;—পথের ধারে জলবাহী গাড়ীটার পাশে একটা চট বিছাইয়া সে শুইয়া আছে—খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতেছে মধ্যে মধ্যে। তীব্র ক্লান্তি সত্ত্বেও কেন কে জানে প্রভাতের কিছুতেই ঘুম আসিতে চাহিতেছে না। স্বপ্নাবিষ্টের মতো

নিশ্চল হইয়া সে পড়িয়া আছে। যে-অন্ধকার সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে আজীবন, তাহা যেন এক অপ্রত্যাশিত আলোক-সম্পাতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। নারী সম্পর্কে তাহার বদ্ধমূল ধারণাটা উপড়াইতে বসিয়াছে যেন—ইহাদের মধ্যেও তো কল্যাণীমূর্তি, প্রেমমূর্তি, মাতৃমূর্তি থাকিতে পারে!...মাথিনকে প্রথম কত সন্দেহের চোখেই না দেখিয়াছে প্রভাত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে ততই যেন সে তাহার মধ্য হইতে নূতন নূতন বিস্ময়ের বস্তু আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে।...... অতীত স্মৃতির টুকরোগুলি প্রভাতের মনের গহনে ভিড় জমাইয়া তুলিল। মাথিনের পাশে রাখিয়া তপতীকে সে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে যতই বিচার করিতে গেল, ততই যেন মাথিনের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া চলিল।...

এইভাবে গভীরতর হইয়া উঠিল শীতার্ত রাত্রি। ইতিমধ্যে রুগ্ন শিশুটিকে পাশে শোয়াইয়া মাথিনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাঁপানীগ্রস্ত বৃদ্ধ সাম্পান চালকটিও নীরব—তাহারও তন্দ্রা আসিয়াছে বোধ করি। আসাম-লতার ঝোপের পাশে ঘুমন্ত মগ গাড়োয়ানদের মধ্যে কাহার যেন বিকট-ভাবে নাক ডাকিতেছে। প্রভাতের সম্মুখ দিয়া কে একজন অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া গাড়ীগুলির দিকে অগ্রসর হইতেই তাহার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকটা একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া মালপত্রবাহী গাড়ীটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বালিশের পাশ হইতে প্রভাত টর্চটি তুলিয়া লইল। তারপর বিছানা ছাড়িয়া নিঃশব্দ পায়ে আগাইয়া চলিল গাড়ীটার দিকে। আচমকা ছইয়ের মুখে আসিয়াই টর্চ জ্বালিয়া ধরিল প্রভাত: অদূরবর্তী কোন এক দলের একজন কোরঙ্গী বস্তাটা খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চিবাইতে সুরু করিয়াছে! টর্চের তীক্ষ্ণ আলো মুখে পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই কেমন যেন স্থির হইয়া আসিল তাহার চোখ দুটি—গলার দুধারের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে! প্রভাতের বুঝিতে

বাকি রহিল না, তাড়াতাড়ি গিলিতে গিয়া গলায় চাল আট্‌কাইয়া গেছে লোকটার। ক্ষিপ্র গতিতে প্রভাত ছুটিয়া গিয়া জলবাহী গাড়ীটা হইতে একপাত্র জল লইয়া আসিয়া তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল।

মুহূর্ত কয়েক পরে যেন দম পাইল লোকটা। বিবসন লোমশ বুকখানা তাহার দুলিয়া উঠিল। অপরাধীর মতো একবার তাকাইয়া গাড়ীর ভিতর হইতে সে নামিয়া আসিল নীরব-নতমুখে। প্রভাত নিঃশব্দে এক তাব্বি চাল বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। কোরঙ্গী কুলিটা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া মুগ্ধ নয়নে তাকাইল প্রভাতের পানে। অদূরবর্তী প্রজ্বলিত কুণ্ডের লাল্‌চে আভায় এই মুহূর্তে প্রভাতকে কেন যেন বন-দেবতা বলিয়াই মনে হইল তাহার।

প্রভাত মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে একটা মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া পরিধানের ছিন্ন বস্ত্রের কোঁচাখানি মেলিয়া ধরিল কোরঙ্গী কুলিটা। দর দর করিয়া তথন তাহার চোখের জল ঝরিতে সুরু করিয়াছে।

তারপরে আরো দু'দিন কাটিয়া গেল।

তাহারা তেমনি আগাইয়া চলিতেছে। টাঙ্গুপে পৌঁছিতে আরো দিন দুই তিন লাগিয়া যাইবে। আজ মাত্র চার পাচ দিন হইল তাহারা এই পথ ধরিয়া আসিতেছে; কিন্তু তবু কেন জানি মনে হয় মস্ত বড় একটা যুগ যেন কাটিয়া গেছে ইতিমধ্যে এবং এই পথ-চলা যেন আর ফুরাইবে না কোনদিন। ক্লান্তি-বিরস সকলের মুখ, বিনা স্নানে মাথার চুলগুলি রুক্ষ—ধূলি-ধূসর পা দুখানা কোন প্রকারে টানিয়া টানিয়াই তাহারা চলিয়াছে এই বিভীষিকাপূর্ণ পথটি ধরিয়া।

তথন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। পথের ডান পাশে উদ্ধত পাহাড়,

বাঁ দিকটা ঢালু—কোন্ অতলে যে নামিয়া গেছে কে জানে। অদূরে একটা কাঠ-ময়ূর হা হা করিয়া হাসিতেছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রভাত থমকিয়া দাঁড়াইল। বাঁ-পাশের খাড়া পাহাড় বাহিয়া কাহারা উঠিয়া আসিতেছে পথের উপর। ঘর্মাক্ত দেহ, আরক্তিম চোখ, শরীরের নানা স্থানে কাঁটার আঁচর — রক্ত ঝরিতেছে। বাহির হইয়া পড়িয়াছে ফালি ফালি শুকনো জিভ। তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে ডলু-বাঁশের ছোট একটা চোঙ্গা—তরল কাদার মতো কিসে যেন পরিপূর্ণ।

প্রভাতের কাছে মুহূর্তে ব্যাপারটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। পিছনে ফিরিয়া হাত নাড়িয়া কী একটা ইঙ্গিত করিল সে। পরক্ষণেই ফিরদৌস এক পাত্র জল লইয়া ছুটিয়া আসিল জলবাহী গাড়ীটা হইতে।

পানি! পানি!—তৃষ্ণায় মুমূর্ষুর দল মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। একজন বৃদ্ধ শুষ্ক কণ্ঠে প্রায় চীৎকারই করিয়া উঠিল: পানি! পানি!

প্রচণ্ড তৃষ্ণায় যখন তাহাদের বুকের ছাতি ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, তখন তাহারা শত শত ফিট নিচে নামিয়া পড়িয়াছিল জলের সন্ধানে। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, জলের পরিবর্তে তরল কাদাই শুধু জুটিয়াছিল তাহাদের ভাগ্যে। তবু আঁজলা ভরিয়া তাহাই পান করিয়া গলাটাকে একটু ভিজাইয়া না লইলে নিচেই হয়তো চিরকালের মতো বাঁধা পড়িতে হইত! কিন্তু লতাগুল্ম ও কণ্টকময় ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া খাড়া পাহাড় বাহিয়া আবার উঠিতে গিয়া তাহাদের তৃষ্ণাটা যেন পূর্বের চাইতেও প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিয়াছিল। মরণই তো ছিল অনিবার্য এবং এই মুহূর্তে 'জীবন' নামক পদার্থটি চোখের সামনে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হাজির হইতেই বিহ্বল-কণ্ঠে যে চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কী!

সব চলারই শেষ আছে।—একদিন তাহাদের এই পথও ফুরাইয়া আসিল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী।—

তখন শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে টাঙ্গুপের খাঁড়িটার উপর; সাম্পান-ঘাটে প্রভাতদের দলটি কিছুক্ষণ হইল আসিয়া পৌছিয়াছে। ফিরদৌস, মিয়াজান প্রভৃতি কয়েক জন মাল-পত্রগুলি সাম্পানে তুলিয়া লইতে ব্যস্ত। প্রভাত এবং মলয় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সাম্পান চালকদের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সুরেশবাবু, বিকাশ ও সিরাজকে দেখা যাইতেছে না—হয়তো বাজারে গেছে জিনিষপত্র কিনিতে। একটা সাম্পানের ছইয়ের উপর বসিয়া মাথিন তাহার উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে দিগন্তের পানে: হংস-মিথুন উড়িয়া চলিয়াছে দূর বনানীর রেখা ঘেঁষিয়া। মাথিনের মুখখানি ম্লান; চোখে বেদনার ছায়াপাত— যে-শিশুটিকে সে টাঙ্গুপের পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাকে সেই পথেই বিসর্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে। লোকান্তরিতের রাজ্যে জননীর অঙ্কশায়ী হইয়া হয়তো সে এখন পরম পরিতৃপ্তিতে স্তন্য পান করিতেছে।

এখন নদীতে পরিপূর্ণ জোয়ার। জল অনেকটা শান্ত। খানিকক্ষণ পরেই আবার ভাটার টান পড়িবে। আর সেই টানের সঙ্গেই সুরু হইবে তাহাদের যাত্রা। অগণিত ছোট বড় খাঁড়ির লবণাক্ত জল কাটিয়া, জোয়ার-ভাটার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সাম্পানে আকিয়াবে পৌছিতে তাহাদের প্রায় নয় দশ দিন লাগিয়া যাইবে।

কয়েকটা দিন নদীপথে কাটিয়া গেল ধীর-মন্থর গতিতে।

তখন রাত্রি গভীর। নির্মেঘ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। নির্মল-শুভ্র

জ্যোৎস্নালোক চারদিকে রহস্যময় মায়াজাল বুনিয়া তুলিয়াছে। সাম্পান-গুলির লণ্ঠনের স্তিমিত আলো নদীর জলে বিক্ষিপ্ত ভাবে তরল সোনা ছড়াইয়া রাখিয়াছে যেন। বাঁ তীরে পেরাবনের মায়াময় একটা ধূসর-রেখা। নদীর অপর তীরবর্তী কোন মগ-পল্লী হইতে ক্রমাগত একটা কুকুরের করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। জোয়ারে সাম্পানগুলি চলিয়াছে ভাসিয়া। দাঁড় টানার একটানা শব্দ। দূর পশ্চাতে কোন্ এক মাঝি জারি-গান জুড়িয়া দিয়াছে ; মাঝ-গাঙ দিয়া বহিয়া যাওয়া একটা সাম্পানের ছইয়ের উপর বসিয়া ভায়োলিনে দরবারী আলাপ করিতেছে মলয়। মাথিন তাহারই পাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। তাহার অসংযত কেশের অবাধ্য একটি গুচ্ছ মুহুর্মুহুঃ দক্ষিণ কপোলের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে মৃদুমন্দ বাতাসে। হাতকয়েক পিছনের অন্য একটি সাম্পানের ভিতর হইতে শোভনা বাঈ মোহাচ্ছন্নের মতো বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ বাজিয়া ভায়োলিন থামিয়া গেল। মলয় মৃদুকণ্ঠে ডাকিল : মাথিন !

ধীর শান্ত-কণ্ঠে মাথিন কহিল,—বল ?

—সারাটা দিন তুমি কেমন যেন উদাস হয়ে আছ ;—কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলছো না !

—সত্যি কিছু হয়নি আমার মলয়।

—কি জানি, হয়তো তোমার মনের কোনো কথা জানবার আমার অধিকার নেই বলেই বলছো না।

মুহূর্তে কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল মাথিন। কাতর-দৃষ্টি মেলিয়া সে তাকাইল মলয়ের পানে। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে কহিল,—ও কী বলছো তুমি !

—আজ সারাটা দিন তুমি ভাল কোরে আমার সঙ্গে একটি কথাও কওনি মাথিন। এর জন্যে আমি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছি।

—নিজেকে অপরাধী মনে করছো! কী বলছো মলয়! অমন কোরে কথা বলো না—প্রাণে আমার বড় লাগে।—মাথিনের কথাগুলি কেমন যেন জড়াইয়া আসিল।

—অপরাধী আমি সত্যি। তা নইলে আজ—

—না, না—অমন কথা বলোনা মলয়। তুমি আমাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছ, এটা তো আমার পরম সৌভাগ্য। বিশ্বাস কর মলয়—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাথিন: গত রাতে কী একটা একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম—সেই থেকে আমার মনটা বার বার কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, আমার এত সুখ ভগবান বুঝি—

বাধা দিয়া মলয় কহিল,—ছিঃ ছিঃ তুমি এত ছেলেমানুষ। ওসব স্বপ্ন-টপ্নও আবার বিশ্বাস করতে আছে?—বলিয়া সে মাথিনকে নিবিড় ভাবে বুকে টানিয়া আনিল। কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—বল, ওসব নিয়ে আর ভাববে না।

মুখখানি তুলিয়া সলজ্জ করুণ হাসি হাসিল মাথিন: ছিঃ ছাড়ো—মাঝিগুলো চোখ বুজে দাঁড় টানে, না?

সম্মুখ দিয়ে এক ঝাঁক ওয়াক পাখী ডাকিতে ডাকিতে জলের ঠিক উপর দিয়া উড়িয়া গেল নদীর অশান্ত বুকে সঞ্চরমান ছায়া ফেলিয়া।

আট

আকিয়াব।

আরাকানের এই প্রসিদ্ধ বন্দরটির চালের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুন্দর ছোট্ট সহরটিতে আসিয়া জুটিয়াছে অগণিত ভারতবাসী; শুধু তাহাই নয়—এই আরাকান প্রদেশের নানা স্থানে অজস্র বাঙালী—চট্টগ্রামবাসী মুসলমানেরা পুরুষানুক্রমে বসতি স্থাপন করিয়া আছে। কৃষিকার্য, সাম্পান-চালনা প্রভৃতির দ্বারা তাহারা অর্থোপার্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এবং নিরুদ্বেগ তৃপ্তিতে দিন অতিবাহিত করিতেছে। স্থানীয় আদিম অধিবাসী মগের দল অন্তরে ইহাদের প্রতি একপ্রকার বিদ্বেষ পোষণ করিলেও মুখ ফুটিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে দেয় না। তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে এই বাঙালীদের স্পর্শ না লাগিলে ক্ষেতে সোনা ফলিবে না—ভুখাই থাকিতে হইবে নিজেদের,—কৃষিকার্যে যে নিতান্তই অপটু তাহারা। এই হেয়তা-বোধটুকুর জন্যই মগেরা বাঙালীদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে এতদিন। সোনার বাঙ্‌লার ছেলে-মেয়েরা মগের মুল্লুকে আসিয়া সোনা ফলাইয়া চলিয়াছে।

সেদিন ৪ঠা মার্চ। দুদিন হইল প্রভাতের দলটি আকিয়াবে পৌঁছিয়াছে। স্ট্রাণ্ড রোডে চৌধুরী কোম্পানির বিরাট ধানের কারবার। সিরাজের নিকটাত্মীয় আলম সাহেব এই প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী।

সিল্‌ভার স্ট্রীটের উপর নিজের বাসাবাড়ীতে তিনি অতিথিদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

সারা সহর অস্বাভাবিক আতঙ্কে নির্জীবের মতো পড়িয়া আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিটা যখন ইদানীং একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপই ধারণ করিয়াছে তখন বর্মার একপ্রান্তে অবস্থিত এই আকিয়াব সহরটিরও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা যে ব্যাহত হইয়া পড়িবে তাহা আর এমন আশ্চর্য কী! রেঙ্গুনের পতন হইয়াছে। জাপানীরা ক্ষিপ্র গতিতে একটির পর একটি সহর দখল করিয়া আগাইতেছে। বেসিন্ হইতে তাহারা নাকি এইদিকেই আসিতেছে উপকূল ধরিয়া। এখানেও তাই পলায়নের হিড়িক পড়িয়া গেছে বিদেশীদের মধ্যে।

তখন বেলা প্রায় দশটা।

বড় গোছের একটা কামরার এক কোণে নিজের বিছানার উপর গা এলাইয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে মলয়। কক্ষান্তর হইতে মাথিনও আসিয়াছে। মলয়ের স্যুটকেসটি খুলিয়া সে কাপড় চোপড়গুলি গুছাইয়া রাখিতেছে। পাশেই বিকাশের সীট্—সে শুইয়া কী একখানা বই পড়িতেছে। ওপাশে, দক্ষিণের খোলা জানালাটার কাছে পাশাপাশি তিনখানা সীট। ঘরের মাঝখানটায় একটা কাশ্মীরী কার্পেট পাতা রহিয়াছে। তাহার উপরে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা মখ্‌মলের তাকিয়া।

কোথা হইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল প্রভাত ও সিরাজ। মলয়ের সীটের পাশে আসিয়া তাহারা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। সিরাজ কহিল, আজ ডেফিনিট্ খবর পেলাম মলয়বাবু, চার পাঁচদিনের মধ্যেই কোলকাতার একখানা জাহাজ ছাড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে-জাহাজে যেতে

পাচ্ছি না। জানেনই তো, আমাদের দলের বেশীর ভাগ লোকই সব কিছুই খুইয়ে এসেছে—দু'তিন গুণ ভাড়া দিয়ে জাহাজে যাবার মতো কারো সামর্থ্য নেই—তাদের হেঁটেই যেতে হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে ওদের ছেড়ে আমাদের কয়েকজনের জাহাজে যাওয়াটা নিতান্তই বিশ্রী দেখায়। তাই বলছিলাম, আপনারা দু'জন জাহাজে যান। অনর্থক পায়ে হেঁটে কষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। আপনি একা হলেও বা কথা ছিল—সঙ্গে মিস্ থিন্ রয়েছেন। তাঁর পক্ষে আরাকানের নদী আর পথ বেয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব।

স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করিয়া নম্র কণ্ঠে মাথিন কহিল, এতটা পথ এলাম সঙ্গে, আর বাকী পথটুকু জাহাজে যাবো আপনাদের ছেড়ে! না, না, তা হয় না। আর তা ছাড়া আমার কোনই কষ্ট হবে না—জানেন তো আমরা বর্মী মেয়ে।—বলিয়া মাথিন মৃদু হাসিল।

—আপনি বুঝতে পরছেন না মিস্ থিন্। অনেকটা পথ। এই ধরুন না—আকিয়াব থেকে ভুথিদং—সাম্পানে; ভুথিদং থেকে মংডু—পাহাড়ী পথে পথে। সেখান থেকে আবার সাম্পানে চড়ে উখিয়ার ঘাট—বাংলার শেষ সীমা। তারপর আরাকান রোড ধরে চার পাঁচ দিন ক্রমাগত হেঁটে চলা—পালং, ইদ্‌গং, চকরিয়া, হারবাং প্রভৃতি জায়গা পেরিয়ে তবে সেই দোহাজারী। দোহাজারীর আগে ট্রেন পাচ্ছেন না কোলকাতায় যাবার। অনেকখানি পথ। আমরা পুরুষ মানুষ, কোনো প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে যেতে পারবো,—কিন্তু আপনার পক্ষে—

প্রভাত সিগারেটে আলগা ভাবে একটা টান মারিয়া বলিল,—দেখুন মলয়বাবু, আমার মনে হয়, গতকালের প্রস্তাব মতো কাজ করলেই ভাল হবে। মিস্ থিন্‌কে নিয়ে পথ চলা আর যুক্তিসিদ্ধ নয়। আমি বলি, আপনারা দু'চার দিন অপেক্ষা কোরে জাহাজে কোলকাতায় যান, আর

আমরা কালই রওনা হয়ে পড়ি। নানা কারণে যখন আমাদের পায়ে হেঁটেই পাড়ি জমাতে হচ্ছে তখন অনর্থক আর বিলম্ব কোরে কী লাভ? দলের সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে।

মলয়ের কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সিরাজ আশ্বাস দিয়া বলিল,—কিছু ভাববেন না আপনি। আমার দাদা তো রইলেনই। কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না আপনাদের: জাহাজ দু'চার দিনের মধ্যে নিশ্চিত পেয়ে যাবেন। তবে টিকিট আগে থেকে জোগাড় কোরে রাখতে ভুলবেন না যেন—দেখেছেনই তো জাহাজ ঘাটে ভিড়খানা!

বিকাশ এতক্ষণ কী যেন ভাবিতেছিল বিছানার উপর শুইয়া শুইয়া। এইবার সে অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলিয়া উঠিল: আরাকান রোড! জানো সিরাজ, আজ সেই পলাতক সর্বহারা মোগল বাদশার কথা বারবার আমার মনে হচ্ছে। এই আরাকান রোড তো তাঁরই কীর্তি। প্রাণের ভয়ে এই মগের মুল্লুকে পালিয়ে আসবার সময় পথটি তিনি গড়তে গড়তে এসেছিলেন। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও এই পথটা ধরেই আবার প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে বিভ্রান্ত পলাতকের দল ছুটছে। ইতিহাসের চাকাটা এমনি কোরেই বুঝি ঘুরে ঘুরে আসে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

বড় মসজিদের আকাশচুম্বী মিনার হইতে তখন মুয়াজ্জিনের উদাত্ত কণ্ঠ-নিঃসৃত ভোরের আজান ভাসিয়া আসিতেছে। মলয় সিগারেট মুখে কক্ষে পায়চারি করিতেছে। সারা মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কক্ষের এক প্রান্তে একটা টেবিল—মাথিন পেয়ালায় চা ঢালিতেছে। তাহার

চোখ দুটিতে তখনও যেন ঘুমের আমেজ জড়ানো। শিথিল তাহার কবরী। অধরের রক্তরাগটুকুও মুছিয়া গেছে।

মলয় হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল: গভর্নমেণ্টকে দোষ দিলে কী করে চলবে বল? ওরা কী জানে যে টিকিটের জন্যে এখানে শেয়ার মার্কেটের মতো বীভৎস সব ব্যাপার ঘটছে! দু'দুটো জাহাজ চলে গেল—কিন্তু টিকিটই পেলুম না! মানুষের নৈতিক অধঃপতনটা এতদূর গড়িয়ে গেছে ভাবতেও পারিনি। কাল তো রীতিমতো ঘুষ দিয়ে এলাম! এখন দেখি বেটাচ্ছেলেদের কৃপা-নেত্রে পড়তে পারি কিনা।

মাথিন চামচ দিয়া চা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তুমি অত ভেবোনা। আজ টিকিট না পেলে আমরা প্রভাতবাবুদের মতো হেঁটেই যাব। কী দরকার এত হাঙ্গামে। এখন এসো, চা খেয়ে নাও।

নীরব চিন্তাকুল মুখে মলয় আগাইয়া গেল টেবিলটির দিকে।

জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলিয়া এক পা অগ্রসর হইতেই রীতিমতো হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। এ হেন জনতা চিরিয়া যখন মলয় বাহির হইয়া হ্যাঙ্গিং ব্রীজটার উপর পা রাখিল তখন তাহার অবস্থাটা নিতান্তই করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ঘর্মাক্ত কলেবর; পাঞ্জাবিটার বাঁ হাতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কোথায় যেন উড়িয়াই গেছে স্যাণ্ডেলের একটা ষ্ট্র্যাপ্। মুহূর্তে অপরিসীম বিরক্তিতে মলয়ের মন ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল চিন্তাক্লিষ্ট মুখে। তারপর অন্যমনস্কভাবে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিয়া গেল।

এমন সময় কোথা হইতে তাহার সম্মুখের আসিয়া দাঁড়াইল শোভনা। মৃদু হাসিয়া একান্ত বিনীতভাবে নমস্কারের ভঙ্গি করিল: নমস্তে।

চমক লাগিল মলয়ের। রুমালখানি পকেটে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল,—আপনি! ও হ্যাঁ, আপনিই না আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন?

শোভনা সহজ শান্ত কণ্ঠে কহিল,—জী হ্যাঁ!—এবং পরমুহূর্তেই বিস্ময় প্রকাশ করিল: আপনি এখনো চলে যান নি!

—টিকিট কোথায় পেলাম যে যাব।

—আপনারও দেখছি আমারই দশা!

—কেন, আপনিও কী টিকিট পান নি?

—জী না, আশা করছি আজ পেয়ে যাব।

—আমারও তো আজ পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু পেলাম কই। দালাল বেটা বললো, পরশু সোমবার নাগাদ পেয়ে যাব। এখন দেখা যাক্।

—শুনলাম চার পাঁচ দিনের মধ্যে আর একটা জাহাজ ছাড়বে; আপনি কি এ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানেন?

—আমিও তো ওই রকমই শুনেছি।—বলিয়া মলয় একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল: আচ্ছা, তাহলে এখন আসি;—নমস্তে।—ধীর পায়ে মলয় আগাইয়া চলিল।

আর যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল শোভনা তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মন্নু মিয়া নিকটেই কোথাও ছিল। শোভনার পাশে আসিয়া গলায় ইঙ্গিতপূর্ণ একটা শব্দ করিল। হাসিয়া কহিল,—বলি, এম্নি ধ্যানেই বিভোর হয়ে থাকবে নাকি? এখন চল না টিকিটের সন্ধানে।

শোভনার হারানো সম্বিৎ ততক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দু'টি দিন কাটিয়া গেল।

জাহাজ ঘাটে আসিবার জন্য শোভনাকে অতি ভোরেই গাত্রোত্থান

করিতে হইয়াছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক হইতে সে আর মন্নু মিয়া ঘাটের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ওদিকে উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া শোভনা কাহাকে যেন খুঁজিয়া মরিতেছে। মন্নু মিয়া সাম্পান আর লঞ্চের ইতস্তত যাওয়া-আসাই হয়তো লক্ষ্য করিতেছে। সহসা কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিল শোভনা। পরক্ষণেই সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া চলিল—পিছনে পিছনে চলিল মন্নু মিয়া। হ্যাঙ্গিং ব্রীজটার উপরে আসিয়া একপাশের রেলিং ধরিয়া শোভনা অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একটা সুরাটীদলের পিছনে পিছনে ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে মলয়। বিষণ্ণ-মলিন তাহার মুখ; কপাল ভরিয়া চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শোভনার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। মলয় তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবে, এমন সময় সে ত্রস্তজড়িত পায়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিল; কহিল,—আজো আপনি টিকিট পেলেন না!

—মুখ তুলিয়া বিরস কণ্ঠে মলয় বলিল,—না, পেলাম না। যা সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছি তাতে আর পাবার আশাও নেই।

—এখন তবে কী করবেন?—শোভনার কণ্ঠস্বরে কাতরতা প্রকাশ পাইল।

—কী আর করবো বলুন; আমার সঙ্গীরা যেমন কোরে গেছেন তেম্‌নি কোরেই যাব। তা, আপনার কী খবর? পেয়েছেন টিকিট?

—টিকিট?—মুহূর্তে শোভনার শুভ্র-সুন্দর কপালে কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সেগুলি আবার মিলাইয়া গেল: না, টিকিট আমিও পেলাম না।

—বলেন কি! মেয়ে মানুষ আপনি, বড় দুর্ভোগ বইতে হচ্ছে তো আপনাকে!

একটু ইতস্তত করিয়া শোভনা বলিল,—যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করতে পারি কি ?

—নিশ্চয় পারেন, বলুন !

—এই বিদেশে বিভূঁয়ে একলা বড্ড ভয় করে ; যদি অনুমতি দেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমিও যাব।

—বিলক্ষণ। আপনি আমাদের পথের সাথী হবেন এতে আমার কী আপত্তি থাকতে পারে বলুন ? কাল সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি। ২১ নম্বর সিল্‌ভার স্ট্রীটে আমার খোঁজ করবেন।

—বহৎ স্নুক্‌রিয়া (অনেক ধন্যবাদ)।

—এখন তাহলে আসি, নমস্তে।—মলয় চলিয়া গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে শোভনার সারা মুখখানিতে নামিয়া আসিল গভীর প্রশান্তি। সুর্মা-আঁকা চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল। মোহাচ্ছন্ন ভাবে সে ধীরে ধীরে ভ্যানিটি ব্যাগটা হইতে দুখানা টিকিট বাহির করিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, মন্নু মিয়া !

মন্নু মিয়া রেলিংটার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া বিড়ি ফুঁকিতেছিল। শোভনার ডাকে সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ঃ কী বলছো ?

—এই টিকিট দুটো বিক্রি কোরে এসো কাউকে।

চোখ কপালে তুলিয়া মন্নু মিয়া কহিল, টিকিট বিক্রি কোরে আসবো ! বলি, তোমার মাথাটা খারাপ হয়নি তো ?

—যা বলছি শোন ! বাজে কথায় কাজ কী—এই নাও।—শোভনার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইল।

বিস্ময়াবিষ্ট মন্নু মিয়া দম-দেওয়া পুতুলের মতো হাত বাড়াইয়া দিল।

টিকিট দু'টি দিতে দিতে মৃদু হাসিয়া শোভনা বলিল,—দেখো, আবার

মুনাফা-টুনাফা কোরোনা যেন। যে-দাম দিয়ে কিনেছি সেই দামেই বেচে দিয়ো।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেইদিনই এক ঝাঁক জাপানী বোমারু আসিয়া আকিয়াবের উপকণ্ঠে বোমা বর্ষণ করিয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ডতম বিক্ষোভে সারা সহর এবং সহরতলী মাতিয়া উঠিল।

তখন সবেমাত্র মুমূর্ষু বন্দরটির বুকে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে। দূর জেঠিতে জাহাজের সিটি বাজিতেছে মধ্যে মধ্যে—কোনো মহাকায়া প্রেতিনীর ভয়ার্ত চীৎকারের মতো দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে হুইস্‌লের তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি-তরঙ্গ। সিল্‌ভার স্ট্রীট বাহিয়া লোহার নাল-লাগানো বুটের শব্দ করিতে করিতে এক কাতার মিত্রপক্ষীয় সৈন্য মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। রুমের ভিতর মলয় আর মাথিন জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত। এমন সময় ঝড়ের মতো পর্দা উড়াইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আলম সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলেন: সর্বনাশা ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছে মলয়বাবু, সর্বনাশা ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছে!

—আবার কী হলো!

—আজ বোমা পড়ার পর থেকেই চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এইমাত্র খবর পেলাম, মগেরা বাঙ্গালীদের গ্রামে গ্রামে লুটতরাজ সুরু করেছে—গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে তারা। হাজার হাজার চট্টগ্রামবাসী যারা এদেশে এসে বসতি করেছিলো, তাদের মধ্যে নাকি অনেকেই ইতিমধ্যে পথের ভিখারী হয়ে গেছে। শুধু কী তাই, বেপরোয়া খুনোখুনিও নাকি সুরু করেছে মগেরা।—উত্তেজনার অধীরতায় আলম সাহেবের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল: যে-বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠলো তা

আর নিভবার নয় মলয়বাবু। চারদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখন দেখতে দেখতে প্রতি গ্রামে গ্রামেই ছড়িয়ে পড়বে এ আগুন—মানুষের রক্তে আরাকানের খাঁড়িগুলো লাল হয়ে উঠবে!—আলম সাহেবের কথাগুলি আর্তনাদের মতো শুনাইল।

—এখন কী উপায়!—কেমন যেন অসহায় বোধ হইল মলয়কে—বড্ড ভাবিয়ে তুললেন যে!

এরপরে আর ভাববার অবসরও নেই মলয়বাবু,—কালই রওনা হয়ে পড়তে হবে। আমিও যাব। আমাদের দেশবাসী অনেকেই যাবে। তৈরী হয়ে নিন। আমি একটু ঘুরে আসছি। বড় মস্‌জিদে একটা মিটিং আছে।—বলিয়া আলম সাহেব সসব্যস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মাথিন এতক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাংলা ভাষাটা না বুঝিলেও আকারে ইঙ্গিতে আলম সাহেবের বক্তব্য বিষয়টুকু বুঝিতে তাহার বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আলম সাহেব চলিয়া যাইতেই মাথিন কাতর-দৃষ্টি মেলিয়া মলয়ের পানে তাকাইল।—নিমেষে বুকখানা তোলপাড় করিয়া খেলিয়া গেল কিসের একটা তীব্র আলোড়ন—সারা মুখখানিতে চকিতে বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মলয় আগাইয়া গেল মাথিনের দিকে। মৃদু হাসিয়া তাহাকে নিবিড় ভাবে বুকে টানিয়া আনিল। এক রহস্যময় নামহীন আশঙ্কায় মাথিনের বুকখানা তখন দুরু দুরু কাঁপিতেছে। মলয় আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে কহিল,—একি! তুমি এমন কোরে কাঁপছো কেন!

কিন্তু কোন উত্তর দিল না মাথিন। শুধু মলয়ের প্রশস্ত বুকটিতে নিবিড়তর ভাবে সে মিশিয়া গেল শঙ্কিতা ভীরু হরিণীর মতো।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই আকিয়াবের সাম্পান ঘাটে এক

বিরাট জনতা জমিয়া উঠিল। তীব্র কোলাহলে চারিদিক ফাটিয়া পড়িতে চায়। অগণিত সাম্পান খাঁড়িটার বুক জুড়িয়া কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। আলম সাহেব এখানকার চট্টগ্রাম-সেবা-সমিতির সভাপতি—সেইজন্যই দায়িত্বের গুরু ভারটাও তাঁহার মাথায় আসিয়া চাপিয়াছে। ব্যস্ততা সহকারে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া তিনি চট্টগ্রামী ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে কী যেন সব বলিয়া চলিয়াছেন। আজ এই বিরাট জনতার অধিনায়ক তিনি। মনে মনে উদ্বেগ অনুভব করিলেও প্রকাশ্যে কিন্তু সকলকেই তাঁহাকে আশ্বাস দিতে হয়। সাম্পানগুলিতে দলে দলে লোক উঠিতেছে। প্রায় পুরুষদেরই হাতে লম্বা ঝক্‌ঝকে কিরিচ-দা। সম্মুখে কোথাও যে মগদের সঙ্গে একটা খণ্ড যুদ্ধ বাঁধিবে না, আজিকার দিনে এইরূপ ভরসা কেহই দিবে না তাহাদিগকে। সুতরাং প্রস্তুত হইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তীরে-ফেলা একটা নোঙরের উপর বাঁ পা-টা রাখিয়া মলয় চারিদিকে তাকাইতেছে। তাহার সম্মুখস্থিত একখানা সাম্পানের পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া মাথিন উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে পূর্বাকাশের পানে। অদূরের অন্য একটা সাম্পানের ছইয়ের ভিতর হইতে শোভনা নির্ণিমিখ নেত্রে মলয়ের পানে চাহিয়া আছে।

একটু একটু করিয়া বেলা বাড়িয়া চলিল। অবশেষে অদূর সমুদ্র হইতে জোয়ার আসিল কলোচ্ছ্বাস তুলিয়া! মাঝির দল 'আল্লা আল্লা মোমিন' বলিয়া নোঙর গুটাইয়া লইল। জলপথে চব্বিশ ঘণ্টারও কিছু বেশী লাগিবে ভুথিদঙে পৌছিতে।

জোয়ারের মুখে চলিয়াছে সাম্পানের শোভাযাত্রা। প্রখর তেজে মধ্যাহ্ন সূর্যটা মাথার উপর জ্বলিতেছে। আর একটা বাঁক পার হইলেই বড় নদীতে পড়িবে তাহারা।

অকস্মাৎ সম্মুখের এক সাম্পান হইতে মাঝি উচ্চ-কণ্ঠে হাঁক পাড়িল : হুঁসিয়ার! সবাই ঠাওর করি দেখতো ওরা কারা নদীর মুখে!

শোনা মাত্র পুরুষ যাত্রীর দল হুড়মুড় করিয়া ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইল কৌতূহল-ব্যগ্র চোখে। কে একজন চীৎকার করিয়া জানাইল : না, না, মগ হালারা না—কোন্ এক পোড়া-কপালের দল সাম্পানে উইঠ্‌তেছে, দেইখ্‌তেছো না?

খাঁড়িটার লবণাক্ত উচ্ছল জলস্রোত যেখানে বড় নদীটার সঙ্গে মিলিয়া গেছে একাকার হইয়া, সেই মোহানার নিকটবর্তী হইতে না হইতেই সম্মুখের একখানা সাম্পান হইতে আলম সাহেব হাত উঠাইলেন। মাঝিরা দাঁড় টানা বন্ধ করিল। সকলেরই দৃষ্টি দক্ষিণ তীরে নিবদ্ধ: কয়েকখানা সাম্পান বাঁধা রহিয়াছে। মগ কর্তৃক অপহৃত এবং উপদ্রুত চট্টগ্রামের একদল আরাকানী বাসিন্দা আসিয়া পাড়ে ভিড় জমাইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নারী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মরণ-কান্না কাঁদিতেছে। কে একজন বৃদ্ধ সবুজ রঙের সাম্পানটার পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া বুকে চাপড় মারিতেছে চীৎকার করিতে করিতে। বাতাসে ফুলিয়া উঠিয়াছে তাহার মাথার একরাশ ধূলি-ধূসর চুল। আর একজন কে হাঁটু জলে নামিয়া সর্বাঙ্গে-মাখা রক্তের প্রলেপ ধুইয়া ফেলিতেছে—খণ্ডযুদ্ধে কয়েকজন মগকে যে সে ক্ষুরধার কিরিচ-দায়ের কোপে কচু-কাটা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কী! পাশেই গুটি কয়েক লোক মিলিয়া কাহাকে যেন সাম্পানের পাটাতনের উপর অতি সাবধানে শোয়াইয়া দিতেছে—তাহার বুকখানা রক্ত-মলিন বস্ত্রখণ্ডে জড়াইয়া বাঁধা। অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করিতেছে লোকটি। আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ের বিহ্বলতা, সর্বহারার নৈরাশ্যজনিত অসহায়তা, বিচ্ছেদ-বিরহের দুর্বিসহ

আকুলতা—এইসব মিলিয়া এই দুর্গতদের প্রত্যেককেই যেন চরম বিয়োগান্তের এক একটি জীবন্ত-মূর্তি করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা পেরা বনের ভিতর দিয়া কে একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ভয়ার্ত চীৎকার করিতে করিতে ঃ আমাদের গ্রাম জালাই দিয়া হালারা এদিক পানে ধাওয়া করি আইতেছে!

মুহূর্তে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে যে যেমন করিয়া পাড়িল উঠিয়ই সাম্পান ভাসাইয়া দিল। এবং পরক্ষণেই দেখা গেল মগের একটা বিরাট দল লম্বা লম্বা কিরিচ হাতে পেরা বনের ভিতর দিয়া কলরব করিতে করিতে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে!

মাঝ-গাঙ হইতে আলম সাহেব ডাকিলেন ঃ আইসো ভাইরা, আমাদের সঙ্গে ভিড়া যাও; কোনো ডর নাই। এত বড় দল দেইখ্‌লে ওরা পালাইবো। তা ছাড়া আমরা আছি সাম্পানে।

মগের দল তীরে আসিয়া আক্রোশ-ব্যঞ্জক চীৎকার করিতে লাগিল। সাম্পান হইতে দা ঘুরাইয়া পাল্টা উত্তর দিতে সুরু করিল পলাতকের দল। আলম সাহেব অতি সাবধানে ছইয়ের ভিতর হইতে তাঁহার দোনালা বন্দুকটা বাহির করিরা পর পর দুটি গুলি ছুড়িলেন! দু' তিন জন মগ তীরে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। অবশিষ্ট সকলেই নিমেষে পেরা বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল ভীতি-বিহ্বল চীৎকার করিয়া।

·

বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছে। কেমন যেন শান্ত হইয়া আসিয়াছে নদীর জল। শীঘ্রই ভাঁটার টান ধরিবে। সাম্পানগুলি বাঁ দিকের একটা খাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া তীরে আসিয়া ভিড়িল। বাতাসে ভিজা মাটির

সোঁদা গন্ধ। খাঁড়িটার উভয় তীরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা লোকশূন্য সাম্পান। দু একটাকে ডাঙায় টানিয়া তোলা হইয়াছে। গলুইগুলির উপর পান-কৌড়িরা ডানা মেলিয়া রোদ পোহাইতেছে নিরুদ্বেগে। দলে দলে লোক নামিয়া তীরে উনুন খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বেই ভাত রাঁধিয়া লইতে হইবে তাহাদের। তারপর মাঝগাঙে আসিয়া জোয়ার না আসা পর্যন্ত তাহারা নোঙর ফেলিয়া অপেক্ষা করিবে। তীরে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাম্পান ভিড়াইয়া রাখা বিপজ্জনক—নিকটবর্তী কোন মগ-পল্লী হইতে দস্যুর দল বাহির হইয়া অসতর্ক মুহূর্তে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেই বা কতক্ষণ!

অবসিত ভাঁটার টানে খাঁড়িটার জল নামিয়া চলিয়াছে। উজানের দিক হইতে কী যেন সব ভাসিয়া আসিতেছে জলে। অনেকেরই সেই দিকে চোখ পড়িল। ভাঁটার স্রোতে ভাসমান বস্তুগুলি কাছে আসিতেই সকলের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল—বিস্ফারিত হইয়া উঠিল চোখ। মানুষের অসংখ্য মৃতদেহ! কোনটির শিরভাগ দেহচ্যুত—কোনটির পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া বীভৎস ক্ষতাঙ্কন। কাহারো পেটের দিকটা ফাড়িয়া গেছে। কাহারো কাহারো বক্ষে এক একটা গহ্বর গড়িয়া উঠিয়াছে—একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বিদীর্ণ পাঁজরের ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডের অংশ-বিশেষও চোখে পড়ে! তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে কাহারো স্কন্ধদেশ একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শিশুদের কুচি কুচি করিয়া কাটা হইয়াছিল—জলের উপরে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভাসিতেছে তাহাদের কর্তিত দেহাংশ। নারীদেহগুলি বিবস্ত্র—প্রায় সকলেরই স্তনভাগ ক্ষুরধার কিরিচের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। দূর উজানে, এই ছোট্ট নদীটার তীরবর্তী কোন গ্রামে যে একটা ভয়াবহ মৃত্যুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কী!

বজ্রাহতের মতো পলাতকের দল নিশ্চল হইয়া রহিল। উনুনের উপরে প্রায় ডেক্‌চিগুলিতেই তখন ভাত পুড়িয়া গন্ধ ছড়াইতেছে।

গভীর রাত্রি।

সাম্পানগুলি জোয়ারে ভাসিয়া চলিয়াছে একটানা গতিতে। দাঁড় টানার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। উভয়ের মিশ্রণে রাতের ইথারে বিচিত্র অর্কেষ্ট্রার সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মাথার উপর দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে নিশাচর পাখীগুলি। আকাশে তারার আলো জ্বলিতেছে; আর তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই যেন জ্বলিতেছে নদীর উভয় তীরবর্তী দূর গ্রামগুলি—আকাশ লাল; বহু ঊর্দ্ধে ইথারে নাচিতেছে আগুনের লেলিহান শিখা। থাকিয়া থাকিয়া ঠুস্ ঠাস্ শব্দ শোনা যাইতেছে—আগুনের তাপে বাঁশের খুঁটি, ছাউনির তর্জা প্রভৃতি ফাটিতেছে হয়তো। কান পাতিয়া শুনিলে এদিক ওদিক হইতে মানব কণ্ঠের ক্ষীণ কলরব শোনা যায়। চারিদিকে কেমন যেন গুমোট ভাব—বাতাসের চিহ্নমাত্র নাই। সাম্পানের ছই আর পাটাতনের উপর ভিড় করিয়া অনেকেই বিহ্বল নেত্রে চারিদিকে তাকাইতেছে।

মলয় উদাস কণ্ঠে ডাকিল: মাথিন!

মাথিন ছইয়ের উপর মলয়ের পাশে বসিয়াছিল। নীরবে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে।

মলয় তেমনি উদাস-কণ্ঠে দূর দিগন্ত হইতে চোখ না ফিরাইয়া কহিল,—জানো মাথিন, আজ চারদিকের সর্বনাশা তাণ্ডবের মাঝখানে বসে আমি এক অপূর্ব নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছি। সেখানে ঈর্ষা, দ্বেষ ঘৃণা, সঙ্কীর্ণতা—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে অখণ্ড মধুর শান্তি আর অনির্বাণ প্রীতি।

—তোমার কল্পনার সেই পৃথিবীটা কী কোনোদিন বাস্তবে গড়ে উঠবে মলয় ? আমার মনে যে শুধু সংশয় জাগে আজ !—মাথিন ম্লান মুখে জবাব দিল।

—উঠবে, আমি জানি গড়ে উঠবে।—মলয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ঃ তা না হলে যে বিধাতার সব মঙ্গল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। আজ পৃথিবী জুড়ে লোভের আগুন তার লক্‌লকে জিভ মেলে ধরেছে; কিন্তু এ-আগুন আর কতদিন জ্বলবে ? আজকের এই মূঢ় আত্মঘাতী মানুষগুলো ভুল বুঝতে পারবেই একদিন। আর সেই দিনই পুরোনো পৃথিবীটার ভগ্নাবশেষ থেকে গড়ে উঠবে সোনার ভাবী পৃথিবী। তুমি বিশ্বাস করো মাথিন, এ হবেই।

সহজ শান্ত কণ্ঠে মাথিন বলিল,—তাই যেন হয়। আমার ধ্যানী-বুদ্ধের অহিংসার স্বপ্ন অনাগত নূতন পৃথিবীর মধ্যে যেন সার্থক হয়ে ওঠে মলয়।

এমন সময় অদূর পিছনের কোন্ এক সাম্পান হইতে শিশুকণ্ঠের কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সেই দিকে মুখ ফিরাইল মলয় ও মাথিন। তাহাদের কানে আসিল, কে যেন বলিতেছে ঃ করিমের একটা ছেলে হইছে ভাই মোস্তাফা।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্নে জড়িত বুঝি নবজাতকের চক্ষু দু'টি।

ভুথিদং।

ঘাটে ঘাটে নানা স্থান হইতে অজস্র সাম্পান আসিয়া জড় হইতেছে। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য হইতে দু'টি দল গড়িয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যে। গুরু সংখ্যক দলটি কোন্ এক তাম্বী সাহেবের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মগদের

একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। প্রতিশোধ নাকি তাহারা লইবেই। শুধু প্রতিশোধই বা বলি কেমন করিয়া; তাহারা কেবল রক্তপাত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না; সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিবে এই মগজাতিটাকে। গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে-জঙ্গলে আক্রমণ চালাইয়া তাহারা ইহাদের বংশ নিপাত করিবে—এবং ইহাদেরই রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া মহানন্দে নৃত্য করিবে। মগদের এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাচার দমনে তাহারা সকলেই জীবন-পণ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু লঘু সংখ্যক দলটি রিক্ততার বোঝা মাথায় করিয়া স্বদেশে ফিরিতেই উন্মুখ।

সদলবলে আলম সাহেব যখন ভুথিদং-এ পৌঁছিলেন তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। এখানে ইতিপূর্বে যে অগণিত লোক জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাদের একটা বিরাট দল তাম্বী সাহেবের অধিনায়কত্বে রথিদং অভিমুখে অভিযান করিয়া গেছে। আলম সাহেব এবং তাহার দলটিকে আজ বাধ্যতামূলকভাবে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। এই বেলায় মংডুর পথ ধরিলে মাঝপথে যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিবে—এমন দুর্দিনে রাত্রিতে পথ বাহিয়া চলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

আগামীকল্য তাহারা মংডু অভিমুখে ঊষাযাত্রা করিবে।

ভুথিদং হইতে মংডু পর্যন্ত বিশ মাইল দীর্ঘ একটি সুপ্রশস্ত পথ। একদিন যাহা রেলপথ ছিল আজ তাহা রাজপথে পরিণত হইয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিছুটা অগ্রসর হইলেই আলিহং-এর পাহাড় আর জঙ্গল। পথটি এখানে আসিয়া গিরিপথ বা 'পাস'-এর আকার ধারণ করিয়াছে। নিবিড়-নিবদ্ধ অরণ্য আর কোথাও কোথাও সুরঙ্গের মধ্য দিয়া পথটি চলিয়াছে। আলিহং-এর গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ক্রোশ দুয়েক গেলেই মংডু—আরাকানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটা ছোট্ট সহর বিশেষ।

খানিকক্ষণ হইল সূর্য উঠিয়াছে। তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে পথ ধরিয়া। প্রায় পুরুষদেরই হাতে ঝক্ ঝকে কিরিচ-দা। আলম সাহেব নিজেই কাঁধে ফেলিয়াছেন বন্দুকটা। সম্মুখে আলিহং-এর গিরিপথ চোখে পড়িতেছে। পলাতক বাহিনীর প্রায় সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল : এই পাহাড়ী পথের উভয় পার্শ্ববর্তী বিশ্রী জঙ্গলের মধ্যে আততায়ীরা ওৎ পাতিয়া বসিয়া নাই তো!

আশঙ্কাই সত্য হইয়া গেল শেষে। আলিহং-এর গিরিপথ বাহিয়া কিছুটা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথের পার্শ্ববর্তী ঝোপ-ঝাড় এবং গাছের আড়াল হইতে একদল সশস্ত্র মগ পথিকদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশভেদী কোলাহলের মধ্যে উভয়পক্ষে একটা তুমুল হত্যাকাণ্ড সুরু হইয়া গেল। মলয়, মাথিন, শোভনা এবং আরো কয়েকজনকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়া আলম সাহেব বন্দুক বাগাইয়া ধরিলেন। কিন্তু উভয়পক্ষের লোক যেখানে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে সেখানে গুলি চালানো যায় না। এই দোনলা বন্দুকটার অস্তিত্ব অস্বীকার এবং উপেক্ষা করিয়া কোন আততায়া যদি একান্ত-পক্ষেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় তবেই গুলি ছুঁড়িতে হইবে। সতর্ক সজাগ দৃষ্টি ফেলিয়া আলম সাহেব এদিক ওদিকে চাহিতে লাগিলেন : ভয়াবহ মৃত্যুযজ্ঞ! তুমুল সোরগোল—হাহাকার, চীৎকার। প্রাণঘাতী মারণাস্ত্রের ক্ষুব্ধ উন্মত্ততা আর অতর্কিত আঘাত! মগদের আক্রোশব্যঞ্জক হুহুঙ্কার। আলম সাহেবের চোখের সম্মুখে যেন কারবালার লড়াই চলিতেছে! ঠন্, টন্, ঠনাটন্—উভয়পক্ষের কিরিচ দায়ের সংঘর্ষে ক্রমাগত ধাতব আর্তনাদ উঠিতেছে। কেহ কেহ এদিকে ওদিকে পলায়ন করিয়া কিম্বা কোন গাছে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। আর যাহারা প্রাণপণ যুঝিয়া চলিতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এক একটা অন্তিম আর্তনাদ

করিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে পথের উপর। শিশুরা কাঁদিতেছে মায়ের কোলে। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ক্রন্দনধ্বনি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে! পাষাণফাটা চীৎকার করিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে কোন কোন জননী। ভীতিবিহ্বল বালক-বালিকাদের কেহ কেহ দিশাহারা ভাবে আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া মগদের মারণাস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাইতেছে—মাটির উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া তাহাদের রক্তমাখা দেহ মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছে! কিরিচের আঘাতে এদিকে-ওদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে মগ আততায়ী। পলাতকদের কে একজন কোথা হইতে পথের মাঝখানটিতে ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার শিথিল-হইয়া-আসা মুষ্টি হইতে দা'খানা খসিয়া পড়িল মাটিতে। পরক্ষণেই সে নত হইয়া উদ্বেলিত সোহাগ ভরে পথের উপর হইতে তুলিয়া লইল একটি শিশু—তাহারই বহু আরাধনা-লব্ধ পুত্র-সন্তান। মায়ের কোল হইতে কখন যে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেছে কে জানে। শিশুটিকে পিতা নিবিড়ভাবে বুকে জড়াইয়া লইল। আর সেই মুহূর্তেই পিছন হইতে অতর্কিতে বিদ্যুৎ চমকের মতো সাঁ করিয়া লম্বা দা ঘুরাইল এক মগ। পলকে লোকটির শিরভাগ কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় কোথায় গিয়া যেন ছিট্‌কাইয়া পড়িল—মাটিতে ঢলিয়া পড়িল ধড়টি। কিন্তু বাহুদুটি শিশুটিকে তেমনি জড়াইয়াই রহিল। ওঁয়া ওঁয়া করিয়া কাঁদিয়া উঠিল আলিঙ্গন-বদ্ধ শিশু। পথের ডানদিক হইতে কে একজন মগ মাথিনকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রকঠোর কণ্ঠে কী যেন প্রচার করিয়া দিল নিজেদের মধ্যে। শিহরিয়া উঠিল মাথিন। আলম সাহেব মগদের ভাষা বুঝিতেন—সজাগ হইয়া তিনি বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিলেন। দলে খাটো ছিল বলিয়া আততায়ীরা পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহাদের অনেকেই মারা পড়িয়াছে। তাই ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়া দু'একজন

করিয়া মগ পলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ঠিক এমনি সময় পথের পাশ হইতে মগটি চীৎকার করিয়া কী বলিতেই পলায়ন উদ্যত এক মগ যুবক হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল—একটা ঝোপের আড়াল হইতে সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া ছুড়িয়া মারিল তাহার হস্তস্থিত 'ভুরং'টি। অব্যর্থ লক্ষ্য। মাথিনের বুকখানি গভীরভাবে বিঁধিয়া গেল বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ফলকে। পরক্ষণেই সে ঢলিয়া পড়িল পাশে দাঁড়ানো মলয়ের ব্যাকুল বাহুর উপর। মগদের বিশেষ আক্রোশটা মিটিল—বাঙালীদের সঙ্গ লইয়া ভিন্ দেশে যাইবে এদেশের নারী! অসম্ভব।

আততায়ীর দল পলাইয়া যাইতেই যেন গভীর ভাবে অনুভূত হইল হাহাকারের তীব্রতা। কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল পথিকের দল। মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের চোখের সামনে সারা দুনিয়াটা ওলোট পালট হইয়া গেছে যেন! আঘাতটা যেখানে অতর্কিত, শোক এবং বেদনা যেখানে গভীর এবং ব্যাপক, সেখানে মানুষ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর কিম্বা অস্বাভাবিক রকমের উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। এই হতভাগ্যদের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইবে কেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীরব-মন্থর পা ফেলিয়া নিজ নিজ প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল—বিবর্ণ তাহাদের মুখ; পলকহারা নিথর দৃষ্টি অতলস্পর্শী। কেহ কেহ প্রিয়জনের ক্ষত-বিক্ষত দেহ আঁকড়াইয়া আর্তনাদ করিতে সুরু করিল। জননীরা মৃত-সন্তানের বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া বিলাপ করিতে করিতে মাথা কুটিল। ভূপতিত কোন কোন জীবন্ত শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে হামাগুড়ি দিয়া মৃতা জননীকেই বুঝি খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু আলম সাহেবের সম্বিৎ ফিরিতে বেশী সময় লাগিল না। মাঝপথে এই ধরণের বিহ্বল হইয়া পড়া আজিকার দিনে নিতান্তই

বিপজ্জনক। মগেরা পলাইয়া গেছে বটে। কিন্তু সত্যই পলাইয়া গেছে কী ?—আলম সাহেব ভরসা পাইলেন না। তাহারা পলাইয়া গেলেও বড় একটা দল পাকাইয়া পুনরায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেই বা কতক্ষণ। এখনও কয়েক ক্রোশ পাহাড়ী পথটা ধরিয়াই চলিতে হইবে তাহাদের। যাহারা মারিয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন বিপন্ন করার কোন অর্থ হয় না। এখানে এমন শোক-বিহ্বল হইয়া আর কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে অবশিষ্ট সকলেরই মৃত্যু অনিবার্য ! শোকার্ত মুমূর্ষুদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া এখনই আবার সকল অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় লইয়া তাহাদের চলিতেই হইবে। আলম সাহেব উঠিয়া পড়িলেন।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

তখন প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পরেও পথ নাকি চলিতেই হইবে তাহাদের ! তাই আবার যাত্রারম্ভের উদ্যোগ। আলম সাহেব আসিয়া ধীরে মলয়ের কাঁধের উপর হাত রাখিলেন। মলয় মৃতা মাথিনের তুষার-শুভ্র মুখখানির উপর হইতে চোখ না তুলিয়া ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে কহিল,—আপনারা সবাই এগিয়ে চলুন আলম সাহেব। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরে কোনো লাভ হবে না তো ভাই।

আলম সাহেবের চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি সরিয়া গেলেন।

শোভনা তখনও পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল শায়িতা মাথিনের পায়ের কাছটিতে। মলয় তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তেমনি ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে কহিল,—আপনিও যান এঁদের সঙ্গে।

শোভনার যেন চমক ভাঙ্গিল। তাহার চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি চকিতে

অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। কী একটা ঐকান্তিক অনুনয় জানাইতে গিয়াও সে জানাইতে পারিল না। একটু ইতস্তত করিয়া শেষ পর্যন্ত উঠিতেই হইল তাহাকে। ক্ষণেকের জন্য সে একবার মলয় এবং আর একবার মাথিনের পানে চাহিল। তারপর কম্পমান অধর দাঁত দিয়া চাপিয়া সজল নয়নে আগাইয়া চলিল মন্থর অনিচ্ছুক পায়ে।

তখন দলের অবশিষ্ট সকলেই স্খলিত পদক্ষেপে একটু একটু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে সম্মুখের দিকে। আর পথ-প্রান্তে ফেলিয়া-যাওয়া আহত মুমূর্ষু পথিকদের কাতর গোঙানি ছাপাইয়া কে একজন টানিয়া টানিয়া ভাঙ্গা গলায় আর্তস্বর তুলিয়াছে: ও বা-জী, বা-জী... ও মা—মা—ফেলি 'ন যাইচ্ মোরে। ও মা, মা-রে...

রাত্রি গভীর।

মংডুর নদীটায় জোয়ার আসিতেছে সোঁ সোঁ শব্দে। কুয়াশার একটা পাত্‌লা পর্দা পড়িয়াছে জলের উপর। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের ম্লান আলো। নীরব জনশূন্য ঘাট। খানিকটা দূরে একটা সাম্পানের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। বসন্তের বাতাসে তাড়িত জোয়ারের ঢেউগুলি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তাহারই গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ছইটার উপরে কে একজন বসিয়া আছে,—বোধ করি ঘাটের দিকে মুখ করিয়া। ম্লান জ্যোৎস্না-মণ্ডিত কুয়াশার বুক চিরিয়া ক্লান্তি-মন্থর পায়ে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল মলয়। ডান হাতে ভায়োলিন কেসটি ঝুলিতেছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো; পাথরের মতো বিবর্ণ তাহার মুখ; কাঁচের মতো প্রাণহীন শূন্য দৃষ্টি। পা দুটি ধূলি-ধূসর। অপরিচ্ছন্ন পাঞ্জাবিটার বুকে রক্তের দু একটা ছোপ লাগিয়াছে।

অদূরের সাম্পানটা হঠাৎ নোঙর তুলিয়া দাঁড় টানার ক্ষীণ শব্দ করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। সাম্পান হইতে তীরে নামিল শোভনা। আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল মলয়ের সম্মুখে। ধীর শান্ত কণ্ঠে কহিল,—আসুন।

মলয় কিছু বলিল না। শুধু মুহূর্তের জন্য একবার সে চাহিল শোভনার মুখের পানে। তারপর তেমনি নীরবে ধীরে ধীরে সাম্পানে উঠিয়া পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই জোয়ারের টানে সাম্পানখানা কুয়াশার অন্তরালে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

মধ্যে একটা দিন কাটিয়া গেল অলস মন্থর গতিতে।

আর একটি নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। নোনা জল কাটিয়া ঢেউ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সাম্পানখানা চলিয়াছে আগাইয়া। শুভ্র পালে হাওয়াটা ভাল করিয়াই ধরিয়াছে। মলয় ছইয়ের উপর বসিয়া আছে। ভায়োলিনখানি কাঁদিয়া চলিয়াছে তাহার অন্তরের সঙ্গে। পাটাতনের উপর বসিয়া সম্মুখ পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে শোভনা। মন্নু মিয়া ছইয়ের ভিতরে ঘুমাইতেছে অকাতরে।

মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে বৃদ্ধ মাঝি বলিয়া উঠিল : ঠাহর করি দেখেন বাবু, ওই যে চাটগাঁয়ের কিনারা দেখা যায়।

ভায়োলিনের সুর ধীরে ধীরে একটি করুণ মীড়ে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। সম্মুখের পানে শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া ধরিল মলয়—দূরে বাঙলার মাটির একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট তট-রেখা।

বাঙলা—সোনার বাঙলা। তাহাদের মাতৃভূমি। যে দেশের মাটিতে তাহারা জন্মিয়াছে, যে মাটির দুর্বার টানে তাহারা মৃত্যু-অভিসারে

আগাইয়া আসিয়াছে এতদিন। আলো-আঁধারের অপূর্ব পটভূমিতে সেই স্বর্গপুরী তাহার চোখের সামনে দেখা দিল!

কিন্তু কোন প্রকার উচ্ছ্বাস তো দূরের কথা, সামান্যতম চাঞ্চল্যের একটা অতি ক্ষীণ আলোড়ন পর্যন্ত জাগিল না মলয়ের মনে। ইহার পরিবর্তে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকখানা দোলাইয়া বহিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই উখিয়ার ঘাটে তাহাদের সাম্পানখানা আসিয়া ভিড়িল। ভায়োলিন কেস হাতে বাঙলার মাটিতে অবতরণ করিল মলয়।

শোভনা ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল পাটাতনের উপর। মলয়কে যাইতে দেখিয়া কাতরভাবে কহিল,—এখনো যে রাত রয়েছে, চলতে একটু কষ্ট হবে না?

—রাত, তা হোক। আমি চলতে পারবো।—উদাসী মলয় ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল।

—বেশ চলুন তবে।—শোভনাও নামিয়া পড়িল তীরে।

মলয় মুখ ফিরাইল, ধীর শান্তকণ্ঠে কহিল,—আমি একা, একাই আমাকে যেতে দিন। ধন্যবাদ আপনাকে।—মলয় ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল। অতীতের শত সহস্র পথিকের পদচিহ্ন বুকে করিয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া আছে—আরাকান ট্রাঙ্ক রোড।

আর পাথরের মূর্তির মতো শোভনা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দরিয়ার উপকূলে। একটা দুরন্ত দমকা বাতাসে তাহার শিথিল কবরীটি খুলিয়া ছড়াইয়া পড়িল। অঝোর ধারায় ঝরিতে লাগিল তাহার [illegible] নয়ন দুটি।

সম্মুখে পূর্ব দিগন্তে তখন শুকতারাটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

রচনাকাল:
এপ্রিল, ১৯৪২